বামাবোধিনী পত্রিকা।

1907.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৫ কল্প। ৫২৭ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩১৪। জুলাই, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজভ্রমণ—সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা ভূমধ্যসাগর ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে ফিরিয়াছেন।

বুদ্ধোৎসব—গত (১২ই বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের জন্ম, নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণে উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় বৌদ্ধদিগের এক মহাসভা হইয়াছে। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি ছিলেন এবং ধর্ম্মপাল মহোদয় বক্তৃতা করেন।

আর্য্য সমাজের রাজভক্তি—সার ডেনজিল ইবেটসনের বিলাতযাত্রাকালে আর্য্যসমাজের লালা হংসরাজ ও রায় বাহাদুর মোহনলাল প্রভৃতি কয়েকজন আর্য্য সমাজের প্রধান সভ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকখানি ধর্ম্ম পুস্তক উপহার দিয়াছেন। পঞ্জাবী ছোট লাট একটু অনুযোগ করিয়া পরে ইঁহাদের রাজভক্তির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ছোট লাটের আরোগ্য—সার আণ্ড্রু ফ্রেজার ব্রাইটিসিজে পীড়িত ছিলেন, আরোগ্যলাভ করিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

রাজ-সম্মাননা—ইংলণ্ডেশ্বর সিপাহী-বিদ্রোহকালীন দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-আক্রমণকারী সেনাপতিদিগের ১১৪ জনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গত ৩রা জুনের বিশেষ রাজদরবারে উঁহাদিগের বিশেষ সম্মাননা করা হইয়াছে।

আমীরের বিলাত ভ্রমণ—আগামী ১৯০৮ সালে কাবুলের আমীর ইংলণ্ড ভ্রমণের মানস করিয়াছেন।

চিনে স্ত্রীজাতির উন্নতি—চিনের চাও নামে রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী স্ত্রীজাতির উন্নতি-কল্পে একখানি দৈনিক পত্র প্রচার করিতেছেন, ইহার নাম "Peking Woman's News" পিকিঙের স্ত্রী-সংবাদপত্র। ১৯০৪ সাল হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

হাকিম সাহেবের দণ্ড—বরিশালের প্রসিদ্ধ ভ্যাক সাহেবের নামে স্বদেশ-হিতৈষী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত যে মান-হানির অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে আদালতের বিচারে খরচাসহ ১০১ টাকা ডিক্রী পাইয়াছেন।

লর্ড মিণ্টোর সদ্বিবেচনা—যে (Colonization Bill) ঔপনিবেশিক আইন পঞ্জাববাসীদিগের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলেও লর্ড মিণ্টো অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

হিন্দু বিধবাশ্রম—পুনাতে স্বর্গগত রাণাডের গুণবতী পত্নী যে আশ্রমের নেত্রী, তাহার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। গত ১৯০৬ সালে ইহার অধিবাসিনীর সংখ্যা ৬০ হইতে ৭৫ হইয়াছে। বার্ষিক আয় ২২ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ১২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আশ্রমস্থ একটী মহিলা প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্ত্রীস্বত্বাধিকার—সুসভ্য ইংরাজজাতি আজও স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্বত্বাধিকার দানে কেবল কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু তাহার বিরোধী। রুসিয়ার ফিন্‌লণ্ডবাসিনীদের ন্যায় অষ্ট্রীয়ার মহিলারাও পার্লেমেণ্টে বসিবার ও ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন।

ভাগবতোপাখ্যান।

পরাশর-নন্দন ব্যাসদেব বেদাদি গ্রন্থ সকল সঙ্কলন ও কল্পবৃক্ষসম বেদার্থ-প্রতিপাদক মহাভারত গ্রন্থ জাতি-নির্ব্বিশেষের হিতার্থে রচনা করিয়া এবং প্রাণায়ামাদি কঠোর তপস্যাপরায়ণ হইয়াও হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। একদা অতিশয় অপ্রসন্নমনে সরস্বতী-নদীতীরে নির্জ্জনে অবস্থিতি করতঃ নিজের অপ্রসন্নতার হেতু বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদকে দেখিয়া বেদব্যাস সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহার যোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। নারদ ব্যাসদেবকে অন্য দিন অপেক্ষা কিছু বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন?" ব্যাস উত্তর করিলেন "দেখুন, আমি নিয়মিত ব্রতধারী হইয়া বেদমার্গ অবলম্বন করিয়াছি—অগ্নি গুরু ইত্যাদির যথা-বিহিত অর্চ্চনা ও হোম যাগ করিয়াছি এবং লোকহিতার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। আমি আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। এত বেদাধ্যয়ন করিলাম, এত ব্রহ্মস্বরূপ বিচার করিলাম, এত তপস্যা করিলাম,

কিন্তু হৃদয়ের অভাব দূর হইল না, আমি এখন কি করিব?" নারদ বলিলেন "শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে, ব্রতাচরণ ও সাধ্যসাধনাদিতে, কেবল বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলিলে হৃদয়ে প্রেম-ভক্তি উপজে না। ভগবানে মতি ও রতি জন্মান চাই। তাঁহার অখিল লীলা-রসে মগ্ন না হইলে বাহিরের বৈরাগ্য বা যাগ, যজ্ঞ, তপস্যায় কি ফল? তাহাতে হৃদয়ের শুষ্কতা ঘুচিবে না; বরং দিনের পর দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইবে। স্বচ্ছসলিলবাহিতে যেমন তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, তেমনি শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানেও হৃদয়ের পিপাসা যায় না। তুমি ব্রহ্মবিচার করিয়াছ, কিন্তু তাঁহার বিমল যশঃকীর্ত্তন কর নাই, তাঁহার নিত্য লীলা দর্শন কর নাই। ভগবানের লীলা-রসাস্বাদন করিতে না পারিলে কিছুতেই প্রাণ জুড়াইবে না, অতএব তুমি এখন হইতে ভগবানের যশঃকীর্ত্তনে ও তাঁহার মধুর লীলা বর্ণনে নিযুক্ত হও, দেখিবে অচিরে তোমার হৃদয় প্রসন্ন হইবে। তোমার বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় আকাশ নির্ম্মল হইয়া প্রেমচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। প্রেমভক্তি বিনা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর প্রেমভক্তি হইলে তপস্যারই বা কি প্রয়োজন? ভক্তিহীন কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, ভক্তিবিহীন জ্ঞান শূন্যবাদে পরিণত হয়। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ইহার কিছুই পরম ধর্ম্ম নহে। ভগবানের নিত্যলীলা দর্শন এবং সেই লীলা-রসাস্বাদনই একমাত্র পরম ধর্ম্ম। ইহাতেই জীবের বুভুৎসার পরিতৃপ্তি হয়।"

নারদের এই আখ্যানরাকো উদ্দীপিত হইয়া ব্যাসদেব সেই সরস্বতী-জলে আচমনানন্তর অতীন্দ্রিয় ভগবানে চিত্ত-সমাধানপূর্ব্বক ভক্তিযোগে তাঁহার অরূপ-রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন এবং মায়াভিভূত অজ্ঞান লোকদিগের হিতার্থ লীলা-রসময় এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গিয়া অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অম্বকেশীয় গোস্বামী সম্প্রদায় ইহাকে বিকৃত অবতার-বাদে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানে সচ্চিদানন্দ অরূপ রূপের সহিত জড়মূর্ত্তি ও জড় রূপের সংমিশ্রণ করিয়াছেন, বিশেষ মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রকাশ ও লীলা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহারা প্রেম ও ভক্তির যে উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন, সেজন্য শুষ্ক জ্ঞানী মানুষ তাঁহাদের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি শিক্ষা করিবে। আমরা এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হইতে পাঠক পাঠিকাদের চিত্তবোধার্থ মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি। সম্প্রতি ব্যাসদেব কুন্তিদেবীর মুখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি।

"হে ভগবন্, হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অনাদি হইয়া সকলের আদি হইয়া আছ, তুমিই

করিতেছ নিয়ন্তা। তুমিই সকল প্রাণীর অন্তর ও বাহ্য পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ অথচ তোমাকে কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারে না। তোমাতে সকল বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ, আবার তুমি গুণাতীত। তুমি মায়ারূপ তিরস্করণী (পরদা) দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়াছ। ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান দ্বারা তোমাকে কিরূপে জানা যাইবে? ইন্দ্রিয়গণ সেই মায়ার বিকার। তুমি অপরিচ্ছিন্ন, মূঢ়দৃষ্টি মানুষ যেমন নাট্যঘর নটকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ দেহাভিমানী নরনারী তোমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না। হে বিশ্বাত্মন্, তুমি অজ হইয়া সর্ব্বজীবে বিরাজমান আছ, কেবল ইহাই নহে; কিন্তু নিজ অদ্ভুত চরিত্র দ্বারা তাহাদের চরিত্র দিন দিন উন্নত ও বিশুদ্ধ করিতেছ। তোমার লীলা আমি অবলা কি বলিব? তোমার প্রকাশে জগৎ মোহিত হইয়াছে, কি আর বলিবে? তুমি স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া আছ, তাই অনেকে অনেক প্রকারে তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন। মলয় পর্ব্বতের কীর্ত্তি বিস্তারের জন্য যেমন তাহাতে চন্দনতরু জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ হে ভগবন্! মানবের গৌরব বর্দ্ধনার্থ তুমি তাহার হৃদয়ে জন্ম-গ্রহণ কর। কেহ বলেন এই সংসার পরম আনন্দস্বরূপের আবরণরূপা অবিদ্যা এবং তদুৎপন্ন কাম্য কর্ম্মাদি দ্বারা জীব সকল ক্লিশ্যমান হইতেছে দেখিয়া তুমি স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা তাহা-দিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাক। কেহ বলেন তুমি দেবকী নন্দন, বসুদেবতনয়, যশোদার বাৎসল্য, শ্রীদামাদি রাখালদিগের সখা, রাধিকার প্রেমে তুমি আবদ্ধ, তুমি গোপীজনের প্রাণবল্লভ। প্রভু! এ সকলি তোমার মায়িক রূপ। তোমাকে যে যে ভাবে ভজিতে চাহিয়াছে, তুমি তাহাকে সেই সেই ভাবে ভজনা করিতে দিয়াছ, কিন্তু তোমার এই মায়িক ভজনের অবসানে তোমার স্বরূপ তুমি প্রকাশ করিয়াছ। হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি জীবের বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখ না। তাহার বাঞ্ছিতরূপে তাহার কাছে প্রকাশিত হইয়া তাহার সকল বাসনা, সকল কামনা পূর্ণ করিয়া, তাহার ভবদুঃখ হরণ করিয়া যখন দেখা দাও, তখনি হে হরি, সে তোমার প্রকৃতরূপ দেখিতে পায়, এবং চিরজীবন তোমারি শরণাপন্ন হইয়া থাকে। হে ভক্তজনবল্লভ, তুমি ভক্তেরই প্রাণধন, ভক্তগণই তোমার সর্ব্বস্ব, তুমি তাহা-দিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পার না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এ সকলে তোমার অভিলাষ নাই, তুমি আত্মারাম এবং শান্ত, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, সকলের প্রতি তোমার সমান ভাব, কিন্তু তোমার ভক্ত ভিন্ন এ কথা অন্যে বুঝিতে পারে না। তুমি সকল জীবে সমভাবে বিদ্যমান আছ অথচ ধর্ম্মান্ধ লোকে তোমাকে নিমিত্ত করিয়া পরস্পর কলহ

করে, তোমাতে বৈষম্য দৃষ্টি করে। হে জগদ্‌গুরো, লোক সকলের সম্পদ ঐশ্বর্য্যই তাহাদের দুঃখের কারণ হয় — কেননা সম্বংশে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বহু শাস্ত্রে জ্ঞান এবং ক্রিয়াকলাপে লোকের মদই বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সে আপনাকে অকিঞ্চন ভাবিতে পারে না। তুমি অকিঞ্চন-ধন। অনন্যগতি ও অনন্য-মতি না হইলে তোমার দর্শন পাওয়া যায় না। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদিগকে নিরন্তর এই সংসারে বিপদের মধ্যেই রাখ, তাহা হইলেই তোমাকে নিকটে পাইব, তোমাকে ডাকিব, তোমার শরণাপন্ন হইব, আর তুমি আমাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া কখনই ছাড়িতে পারিবে না। হে হৃষীকেশ, আমি নারী হইয়া আর তোমার কি স্তব স্তুতি করিব? তুমি অনাত্মাত্ম-বিবেকী পরমহংস, ও মননশীল ব্রাহ্মণের-বিরহিত মুনিগণেরও জ্ঞানের অগোচর, আমি আর তোমাকে কি বলিব? তোমাকে মানবীয় ভাবে আমি যে আদর করিয়াছি, তুমি আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা কর—আর হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বাত্মন্, হে অখিলগুরো, হে ভগবন্, আমি অতি ব্যাকুল হইয়া তোমার নিকট এই কামনা করিতেছি, পাণ্ডব ও যাদব-গণের প্রতি আমার যে দৃঢ় মানসিক স্নেহ-বন্ধন আছে, তাহা তুমি ছেদন করিয়া দেও এবং এখন হইতে আমার মতি অনন্যবিষয়িণী হইয়া তোমাতে প্রীত হউক, তাহা হইলে গঙ্গা যেমন সাগরে মিলিত হইতে গিয়া প্রবাহকে বিঘ্ন বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ আমার মতি ও গতি তোমাতে মিলিতে গিয়া কোনও প্রতি-বন্ধক গণনা করিবে না।

শ্রীকেদারনাথ কুলভী।

রসায়ন।

সায়নোজেন বা নীলজন।

Cyanogen (CN or Cy)

NC = 26

ইতিহাস—১৮১৫ অব্দে গে লুসাক্ (Gay-Lussac) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন। অঙ্গার যবক্ষার জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া সায়নোজেন নামক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা হইতে অনেক নীল-বর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে নীলজন কহে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহার এক প্রকার বিশেষ গন্ধ আছে জলে অধিক দ্রব হয়। ইহার গন্ধ পিচ-ফলের পাতার বা আঁটির গন্ধের অনুরূপ। ইহার বহনে C_2O বা শৈত্য সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিন করা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। সায়নো-

যেন যৌগিক পদার্থ হইলেও জড় পদার্থের ন্যায় উহার পরমাণু অপরাপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এজন্য ইহাকে যোগমূল (Compound Radical) পদার্থ কহে এবং এই নিমিত্তই ইহার অপর চিহ্ন Cy হইয়াছে।

প্রস্তুত-প্রণালী—মার্কিউরিক্ সায়নাইডকে (Mercuric Cyanide) উত্তপ্ত করিলে Cy বিযুক্ত হয়,পারদ পাকিয়া যায়; যথা—$Hg\ Cy_2 = Hg + Cy_2$ অঙ্গার ও যবক্ষারজন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া Cy উৎপন্ন করে না। কয়লা ও পটাসিয়ম্ কার্ব্বনেট উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর দিয়া N (যবক্ষারজন) বাষ্পের স্রোত চালাইলে পটাসিয়ম্ সায়েনাইড্ প্রস্তুত হয়। সচরাচর উক্ত প্রকারে পটাসিয়ম সায়েনাইড প্রস্তুত করে না। সিং, চামড়া প্রভৃতি জান্তব পদার্থে পটাসিয়ম কার্ব্বনেট ও লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে পটাসিয়ম্ ফেরো-সায়নাইড্ প্রস্তুত হয়; তাহা হইতেই পটাসিয়ম্ সায়নাইড প্রস্তুত হয়।

৬৫ ভাগ পটাসিয়ম সায়নাইড্ ও ১৭ ভাগ আর্জ্জেন্টিক নাইট্রেট পৃথক্ পৃথক্ রূপে জলে গুলিয়া মিশাইয়া রাখিলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থ জন্মে। ঐ পদার্থ শুষ্ক করিয়া পরীক্ষা-নলে উত্তপ্ত করিলে সায়নোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবল বিষধর্ম্মী বলিয়া এই গ্যাস যখন তখন সংগ্রহ করা উচিত নহে।

হাইড্রসায়েনিক এসিড।
Hydrocyanic Acid.

$HCN = ২৭।$

ইহার অপর নাম প্রসিক এসিড (Prussic Acid)। এক ভাগ সায়নোজেন ও এক ভাগ হাইড্রজেন সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন করে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন তরল পদার্থ। ২৬০৫ অংশ তাপে ফুটিয়া উঠে এবং ১৫ অংশ শৈত্যে জমিয়া কঠিন হয়। গ্রীষ্মকালে ইহাকে তরল অবস্থায় রক্ষা করা দুঃসাধ্য। ইহার ঘ্রাণ দ্বারা শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা ঘটিতে পারে। ইহার প্রকার-বিশেষে তীক্ষ্ণ গন্ধ আছে। ইহার আস্বাদ প্রখর; কিন্তু অম্ল নহে। অধিক জলের সহিত না মিশাইয়া ইহার কোন প্রকার ব্যবহার করা উচিত নহে। ১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ মিশাইয়া ঔষধার্থে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তেমন স্থলেও একবারে এক ফোঁটার অধিক কিম্বা বার বার দেওয়া যাইতে পারে না। ফলতঃ এই ঔষধের ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অনভিজ্ঞ ভিষকের ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে; এবং ইহা ঔষধালয় ভিন্ন বাসস্থলে রাখা

উচিত নহে। এই বিষজন্য অনিষ্ট উৎপত্তি হইলে শীতল জল ব্যবহার দ্বারা তাহার প্রতীকার হইতে পারে। এই বিষ দ্বারা কুক্কুরাদি মৃতপ্রায় হইলে তাহাদের শরীরে শীতল জল প্রবল বেগে ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করা গিয়াছে। এমোনিয়া আঘ্রাণ করিলেও এই বিষের তেজ মন্দীভূত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—পটাসিয়ম্ সায়নাইড্‌কে গন্ধক দ্রাবকের সহিত সংযুক্ত করিয়া বকযন্ত্রে চোয়াইবার সময় যাহাতে এই গ্যাস উড়িয়া যাইতে না পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলতঃ বিশেষ সাবধান হইয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হয়; এবং প্রথম শিক্ষার্থীদিগের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে।

স্বর্গীয় আনন্দমোহনের ঈশ্বর-ভক্তি।

কয়েক মাস হইল "সাধনা"তে, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসুর জীবনী বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন—"স্বর্গের গৌরব যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কখন আনন্দমোহন বসুর ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী বিস্মৃত হইবেন না।" আমরা আজ এই কথাটি লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে চাই।

এ কথা সকলেই জানেন যে আজকাল গীতাগ্রন্থের বড় আদর; কারণ গীতার আদর্শ অতি উচ্চ। গীতার প্রধান শিক্ষা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই তিনটীকেই চোখের সম্মুখে রাখিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে। যেমন উদ্যানের বৃক্ষটি পত্র পুষ্প ও ফলে সুশোভিত হইলেই তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় ও তাহার বৃক্ষ-জন্ম সার্থক হয়, তেমনি মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তিলাভ করিয়া জীবনের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলেই মানব-জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এবং দুর্ল্লভ নরজন্ম সার্থক হয়।

কিন্তু পত্র, পুষ্প ও ফল—একই সময়ে এই তিন বস্তুতে অতি অল্প বৃক্ষকেই সুশোভিত হইতে দেখা যায়। কোনও বৃক্ষের পত্র ও পুষ্পশোভা ত ফল থাকে না; আবার পত্র ও ফল থাকে ত পুষ্প থাকে না। সেইরূপ সংসারে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি-সমন্বিত মানুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই জ্ঞান আছে, অনেকে সৎকর্ম্মও করেন; কিন্তু দুর্ল্লভ ঈশ্বরভক্তি তাঁহাদের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার অনেক ধর্ম্ম-রসজ্ঞ ভাবুক লোকের অন্তরে ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গভীর জ্ঞান ও কর্ম্মস্পৃহা বড় বেশি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আনন্দমোহনের জীবনে কিন্তু এই বিরোধ ভাবেরই সমাবেশ হইয়াছিল। জ্ঞানের দিব্য-রশ্মিতে তাঁহার হৃদয় যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি সে হৃদয়ে ভক্তির কমল প্রস্ফুটিত হইতে দেখা গিয়াছে এবং কর্ম্মেতে তিনি একজন কর্ম্ম-যোগী পুরুষ বলিয়াই গণ্য। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বিস্তর পড়া গিয়াছে; তাই আজ তাঁর ভক্তি সম্বন্ধেই দুএকটী কথা বলিব।

সহবৎসর পূর্ব্বে আমরা কলিকাতায় মাঘোৎসব দেখিতে আসি। তাহার আগে কলিকাতা আসিয়াছি, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে ছিল না বলিয়া ব্রহ্মোৎসব দেখিতে যাই নাই। সে বার ব্রহ্মোৎসব দেখিতে আসিয়া কয়েকজন লোককে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। তাহার মধ্যে স্বর্গীয় প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, পূজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শ্রদ্ধা-স্পদ রবীন্দ্র বাবুর নাম করিতে পারি।

কলিকাতায় আমি যে বন্ধুর বাসায় উঠিয়াছিলাম, তিনি আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া আশ্বাস দিলেন, আমি উৎসবের মধ্যেই এই চারিজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইব। তাঁহার কথাই সত্য হইল। উৎসবের মধ্যে আমি প্রথম যে দিন সাধারণ সমাজের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, সেই দিনই শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা। বক্তৃতার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়কে ত দেখিলামই; তা ছাড়া তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার এক একটি কথা যেন কামানের গোলার মত আসিয়া আমার মনের উপর পড়িতে লাগিল, আমার হৃদয়-দুর্গের চতুর্দ্দিকে কুসংস্কারের যে প্রাচীরটুকু ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া গেল।

তার পর একদিন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের উৎসাহে যুবকদিগের একটি সভার উৎসব হইতেছিল; সেখানে প্রতাপচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজনকেই দেখিতে পাইলাম। সে দিন প্রতাপচন্দ্রের সৌম্য ও প্রশান্ত এবং রবীন্দ্রনাথের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে "বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়" এই সঙ্গীতটি শুনিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আজিও পরিষ্কার মনে আছে।

কিন্তু অন্য সকলকেই দেখিলাম, স্বর্গীয় আনন্দমোহনকে ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর ১১ই মাঘ আসিল। সেদিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই আমরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরে ভয়ানক ভিড়! সেই ভিড়ের মধ্যে সম্মুখে বসা ত দূরের কথা; কোন রকমে পশ্চাতের একটি আসনের একটুখানি জায়গা অধিকার করিয়া বসিলাম। তখন আনন্দমোহনকে দেখিতে পাইলাম। কি ভাবে তাঁহাকে দেখিলাম? দেখিলাম সেই সৌম্যমূর্ত্তি আনন্দমোহন বক্ষঃস্থলে দুখানি হাত রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন; ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে;

তাঁহার নীলোৎপল নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া যাইতেছে; তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা বালিকা কন্যা বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে পিতার প্রেমোজ্জ্বল মুখশ্রীর বিচিত্রভাব নিরীক্ষণ করিতেছে। আমিও অনিমেষ-নয়নে আনন্দমোহনের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম; তাঁহার "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া উপকৃত হইলাম; বুঝিতে পারিলাম, আনন্দমোহন শুধু কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার নহেন, কেবল স্বদেশহিতৈষী ও রাজনীতিজ্ঞ নহেন, কেবল স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদাতা ও সমাজ-সংস্কারক নহেন; আনন্দমোহন একজন ভক্ত। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উৎস লুক্কায়িত আছে, তাই এই উৎসবের ভগবৎ-আরাধনায় অন্তরের ভক্তিভাব নয়নে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর কতবারই ত সাধারণ সমাজের মন্দিরে তাঁহার "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া পুলকিত, বিস্মিত ও উপকৃত হইয়াছি। একবার মাঘোৎসবে সাধারণ সমাজের মন্দিরে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র উপাসনা করিয়াছিলেন। সেবার তাঁহার সুগভীর আরাধনায় এবং কবিত্ব ও দর্শনসংমিশ্রিত অপূর্ব্ব উপদেশে আমরা সকলেই কৃতার্থ হইয়াছিলাম! কিন্তু দেখিলাম উপদেশের সময় আনন্দমোহনের এরূপ ভাবোদয় হইয়াছে যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না; উপদেশের মধ্যেই বুকের উপর দুখানি হাত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

আর একবার আমরা দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়াছিলাম। তখন স্বর্গীয় বসু মহাশয় একটি পীড়িত সন্তানকে লইয়া দার্জ্জিলিং বাস করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার সন্তানটি মৃত্যু হইল। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় আমরা অনেকেই বসু মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্বিনমাসের "প্রবাসী"র প্রবন্ধলেখিকা প্রফুল্লময়ী দেবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভুটিয়া স্কুলের তদানীন্তন হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা করিলেন। তার পর বসু মহাশয় স্বয়ং যখন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নয়ন শিশিরসিক্ত পুষ্পদলের ন্যায় ভক্তির অশ্রুতে আর্দ্র হইল; তাঁহার সেই "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া আমাদের অন্তরও বিগলিত হইল।

এই ঈশ্বরভক্তিতেই বোধ হয় বসু মহাশয়ের প্রকৃতি অতিশয় মধুর হইয়াছিল। একে ত তাঁহার সুমিষ্ট মুখশ্রীরই কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। তার পর তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের মিষ্ট কথায় সকলকেই আকৃষ্ট হইতে হইত। একবার তাঁহার দমদমার বাটীতে মাঘোৎসবের উদ্যানসম্মিলন হইয়াছে। আমরা প্রায় তিন চারি শত পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার মেহগুনি গাছের তলায় বসিয়া গিয়াছি। প্রথম মেয়েরা সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিলেন; পরে উপাসনা হইল। তার পর বসু মহাশয়কে কিছু বলিতে অনুরোধ

করা হইল। তাঁহার এমনই বিনয় ছিল যে, সহজে কোনও গর্ব্বের কথা বলিতে চাহিতেন না। কিন্তু সেদিন সকলের অনুরোধে পড়িয়া কিছু বলিতে স্বীকৃত হইলেন। একটি জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা করিয়া, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট বর্ণনা শুনিয়া মনে হইল, তিনি বাঙ্গলাকাব্যের রসগ্রাহী পাঠক ছিলেন, নচেৎ বাঙ্গলা ভাষায় অমন সুন্দর করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারিতেন না, এবং সেই বর্ণনা দ্বারা আমাদের চিত্তে সুনির্ম্মলা ভক্তির রসধারা উচ্ছলিত করিয়া তুলিতে পারিতেন না।

তাঁহার সুমিষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলি। কলিকাতায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, আমরাও গিয়া সেই আশ্রমে যোগদান করি। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে একসঙ্গেই বাস করিতাম। একবার স্বর্গীয় বসু মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদিগকেও তাঁহার বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা লজ্জাবশতঃ ইহার পূর্ব্বে কখনো বসু মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলি নাই। সে বার শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে বসু মহাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া আলাপ করাইয়া দিলেন। বসু মহাশয় আমাদিগকে কত মিষ্ট কথাই শুনাইতে লাগিলেন। আমরা যখন আহার করিতে বসিলাম, তখন ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী এবং আনন্দমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা আমাদিগকে খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আমরা একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী দ্বারা রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলাম, অন্যদিকে বসু মহাশয়ের সুললিত বাক্য শুনিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিতে লাগিলাম। এমন কি, কেহ যদি কৌতূহল বশতঃ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন,—সে দিন বসু মহাশয়ের বাড়ীর খাদ্যসামগ্রীই অধিক মিষ্ট, না তাঁহার কথা বার্ত্তাই অধিক মিষ্ট, তাহা হইলে সে কথার জবাব দেওয়া কিছু মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইবে। কেন না, খাদ্যসামগ্রীও যেমন মিষ্টরসে পরিপূর্ণ ছিল, বসু মহাশয়ের কথাগুলিও তেমনি সুমিষ্ট বোধ হইয়াছিল;—এই দুই রকম মিষ্টতার তারতম্য করা বড় কঠিন।

আমরা আর একটি কথা বলিয়াই। আমাদের বক্তব্য বিষয় শেষ করিব। আনন্দমোহন ব্রাহ্মসমাজের নিকট যে বার শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, সে বারের কাহিনী বড় মর্ম্মান্তিক। গত মাঘোৎসবের পূর্ব্ব মাঘোৎসবের এক রবিবার অপরাহ্ণকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে বার বসু মহাশয়ই সমাজের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু

পীড়িত ছিলেন বলিয়া সভার সকল অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উক্ত দিবস তিনিই সভায় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। যখন সভাপতির বক্তৃতা করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি কিছু বলিতে চাহিলেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন বসু মহাশয়কে কিছুই বলিতে দেওয়া হইবে না, কারণ বসু মহাশয়ের যে পীড়া, তাহাতে বেশি কথা বলা একেবারে বারণ।

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথা শুনিয়া বসু মহাশয় যেরূপ করুণস্বরে ও কাতরভাবে কিছু বলিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও চক্ষুতে জল আসে। তাঁহাকে মাত্র পনর মিনিট বলিবার সময় দেওয়া হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"আপনাদের নিকট হয় ত আজই আমার শেষ বিদায়, আর যে কখনও এইরূপভাবে এই মন্দিরে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব, আমার সে আশা আর নাই, শরীরের অবস্থা একেবারেই সেরূপ নয়। সেইজন্যই আজ আমি ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও মনের প্রবল আবেগে দু একটী প্রাণের কথা বলিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।" তৎপরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, সমাজের মধ্যে ভক্তির ভাব যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, ব্রাহ্মদিগকে তদ্বিষয়ে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ইহার দুই দিন পরেই ১১ই মাঘ। সে দিন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে লোকে লোকারণ্য। আনন্দমোহন বাবু অপরের প্রবল আবেগে সেই ভিড়ের মধ্যেই সমাজে প্রবেশ করিলেন। প্রায় সমস্ত দিন মন্দিরের মধ্যেই রহিলেন। তাঁহার পত্নী এবং পুত্র কন্যাগণ তাঁহাকে মন্দির হইতে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বসু মহাশয় হয় ত মর্ম্মের নিভৃততম স্থান হইতে এই বাণীই শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, আর তাঁহার প্রিয় ব্রহ্মমন্দিরে আসিবার সুযোগ হইবে না, অদ্য তাঁহার প্রিয় মন্দিরে আসার শেষ দিন; তাই তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধও শুনিলেন না। কিন্তু আমরা ১১ই মাঘ বৈকালে লক্ষ্য করিলাম—তিনি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে।

হায়! সেই ১১ই মাঘ রাত্রে গৃহে গমন করিয়াই যে রোগযন্ত্রণা আক্রান্ত হইলেন, আর তাঁহার হস্ত এড়াইতে পারিলেন না, আর একটি বারও তাঁহার প্রিয় সমাজমন্দিরে আসার সুযোগ হইল না; তাঁহার কথাই সত্য হইল; সেই ১১ই মাঘের বিদায় গ্রহণই তাঁহার শেষ বিদায় গ্রহণ হইল।

তারপর যে দেড় বৎসর বাঁচিয়া-

ছিলেন. তাঁহার পত্নী সঙ্গীত করিতেন, আর তিনি বিছানায় পড়িয়া উপাসনা করিতেন। পীড়া বৃদ্ধি হইবার ভয়ে ব্রাহ্মগণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন না, ব্রাহ্মসমাজের কোন খবরও কেহ তাঁহাকে জানাইত না; তিনি সেজন্য কতই আক্ষেপ করিতেন। এই অবস্থায় একবার সাধনাশ্রমের পরিচালক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বসু মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন—"আমার পীড়া বৃদ্ধি হইবে বলিয়া কেহই আমার কাছে আসেন না; যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিব সে কয়দিনও যদি ধর্ম্মবন্ধুদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে না পারি, তবে বাঁচিয়া ফল কি?" গুরুদাস বাবুকে বলিলেন—তিনি পরলোকে গমন করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহার অন্তরে কোনও ভয় নাই।

এই সকল কথা ও ঘটনাদ্বারা আমরা কি প্রমাণ পাই? আমরা বুঝিতে পারি আনন্দমোহনের অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হইয়াছিল; তিনি জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ন্যায় ভক্তিযোগেও অনেক পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিসমন্বিত জীবন যথার্থই আমাদের অনুকরণের যোগ্য।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

মহাযাত্রা।

(২০এ আগষ্ট)

ঘোর তমসাচ্ছন্ন রেতে একা দাঁড়াইনু
বৈতরণী এ পারেতে, বৃথা বেলা ভূম।
বুঝি ও কতই হলো এ অবশ তনু,
কাঁদিলাম মায়া খেলা, ডাকি কোথা তুমি।
ঘনে ঘন অবিরল গোধূলি-ললাট,
জগৎ তমসাচ্ছন্ন, আলো নিভে গেল;
সকল দুয়ারে চির পড়িল কবাট,
অবরুদ্ধ এ নিভৃতে পশিবে না আলো।
বৈতরিণী এ পারেতে একাই কাঁদিব,
একাই বহিতে হবে দুরন্ত জীবন,
অসীম এ মরুমাঝে একাই চলিব,
একা মাথা পেতে নিব অসহ দাহন।
অবশেষে মহাযাত্রা আসিবে যখন,
হাহাকার ঘুচে যাবে, পাইব সান্ত্বনা;
যাইব বিভুর কোলে, লইব শরণ,
চিরশান্তি মাঝে ডুবি ভুলিব বেদনা।

শ্রীবর্ণপ্রভা বসু।

আতিথেয়তা।

(প্রাপ্ত।)

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে অতিথি-সৎকার প্রথা বহুদিন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। আদিম অতিথি-সেবার ব্যবস্থা যাহাতে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে ভারতীয় নরনারীমাত্রেরই মনোযোগ দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অতিথিসৎকারই এককালে এদেশে একতার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। এক দেশের অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আতিথ্য-নিবন্ধন ভিন্নদেশীয় ব্যক্তির মিত্রতা স্থাপন হইত। সামরিক আতিথ্যের সাদর বন্ধে অনুপ্রাণিত হইয়া, পরস্পরে সাংসারিক, সামাজিক এবং দেশহিতকর সর্ব্ববিধ কার্য্যে পরস্পরকে সহায়তা করিতে পারিতেন। এইরূপে প্রীতি প্রণোদিত হইয়া, পরস্পরে প্রয়োজনমত পরস্পরের সহানুভূতি লাভ করিতেন। প্রাচীন কালে গৃহস্থেরা সমাগত অতিথিকে দেবতা-সদৃশ পরিচর্য্যা করিতেন। অতিথি ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, অথবা শূদ্র হউন, কেহই জাতি-ধর্ম্ম বিচার করিতেন না। অভ্যাগত অতিথিগণ সেকালে তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণ নামে অভিহিত হইতেন; সে বিষয় নিম্ন শ্লোকেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

"উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোপি গৃহমাগতঃ
পূজনীয়ো সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।"

অন্য স্থানে আছে :—

"সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।"

তাঁহারা অতিথিকে অভ্যাখ্যান করা মহাপাপ বিবেচনা করিতেন। নিম্ন-শ্লোকে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ
প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।"

কালের আবর্ত্তনে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থগণ এখন অতিথি-সেবা হইতে বিরত হইয়াছেন। প্রবাসী ব্যক্তিগণও এখন গৃহস্থদিগের আবাসে আতিথ্যগ্রহণে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন। কিন্তু অতি পুরাকালে পথশ্রান্ত প্রবাসী ব্যক্তি অকুণ্ঠিতভাবে গৃহস্থ-আশ্রমে অতিথি হইয়া, পরিচর্য্যালাভে শারীরিক দারুণ ক্লান্তি দূর করিয়া, অন্তরের অন্তস্তলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন। আমাদিগের পুরাণে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। কত সসাগরা ধরার অধিপতি মুনি ঋষি-গণের পুণ্যাশ্রমে আতিথ্য লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান

করিতেন। আবার কত প্রবাসী মুনি ঋষি ও দীনদরিদ্র ব্যক্তিদিগকে রাজা ও রাজোয়ারাগণ স্বীয় প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। এক্ষণে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। আজকাল পরের কাছে অতিথি হইয়া সেবা যত্ন লাভ করা দূরে থাকুক, আত্মীয় কুটুম্বের আশ্রয়ে একরাত্রি যাপন করিবার মত একটু নিশ্চিন্ত স্থান পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিশ্বজনীন সম্মিলন ভাব বিস্মৃত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আতিথেয়তার অভাবেই আমাদের জাতীয় একতার দৃঢ় বন্ধন যে সমূলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এখন আমরা দারুণ অবনতির চরম সীমায় উপনীত। আমাদিগের আর্য্য পিতৃ-মাতৃগণ, অতিথি-সৎকার-ব্রত বিভিন্ন জাতি-সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্বার্থপরায়ণতায় আমরা অতিথি-সৎকার প্রথার নিগূঢ় তথ্য বিস্মৃত হইয়া, উহা হেয়জ্ঞানে পরিহার করিয়াছি। এক্ষণে অতিথি-সৎকারের কথা উত্থাপিত হইলে অনেকেই উল্লেখ করিয়া থাকেন, এই বিষম মহার্ঘতার দিনে অতিথি-সৎকার ব্রত পালন করা অসম্ভব। আর ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় না, অনর্থক পরের নিমিত্ত সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় মাত্র। কিন্তু এই দারুণ মহার্ঘতার দিনে তাঁহারা স্ব স্ব বিলাসের নিমিত্ত যে অর্থ বৃথা ব্যয় করেন, সে ব্যয় কত সংক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা অনুধাবনপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের অনাবশ্যক বিলাসিতা হেতু যত অর্থ বৃথা অপব্যয় হয়, তদ্দ্বারাই পুনর্ব্বার অতিথি-সৎকার প্রথা পালন করা যাইতে পারে। যদি আমরা প্রত্যেক গৃহস্থ, আপনাপন বিলাসিতার মাত্রা সংযত করিয়া, সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ অতিথি-সৎকারে ব্যয় করি, তাহা হইলে আবার আমাদের জাতীয় একতা পুরাকালের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে। ভারতীয় নরনারীর সমীপে আমার ঐকান্তিক সানুনয় নিবেদন, যাহাতে সেই পুণ্যময় অতিথি-সৎকার ব্রত পুনরায় ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলে দৃঢ়সংকল্প হউন।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার-রাজবাটী।

প্রতিজ্ঞা পূরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৬

একদিন দ্বিপ্রহরে লক্ষ্মী মন্দিরে বসিয়া দেবীপূজায় নিবিষ্ট ছিল, এমন সময়ে লক্ষ্মীর মাতুল রমানাথকে সঙ্গে করিয়া সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী তখন ধ্যানমগ্না,—তাঁহাদের আগমন জানিতে পারিল না। মাতুল বলিলেন, "রমানাথ! এই লক্ষ্মী।" মধ্যাহ্নের রৌদ্রতপ্ত পথক্লান্ত রমানাথ দেখিল,—কাননের ছায়াধিষ্ঠ মনোরম স্থানে যৌবনে যোগিনীর ভুবনমোহিনী প্রতিমা—ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র অঙ্গ-কান্তিতে প্রফুল্ল মুখকমলে যেন শান্তি ও প্রীতি উছলিয়া পড়িতেছিল, সে লাবণ্যে যেন স্বর্গের সুষমা ঝরিতেছিল। এই করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি, এই কি রমানাথের অপরিণীতা পত্নী লক্ষ্মী? শ্রান্ত রমানাথ ভগ্নহৃদয়ে মন্দির-সোপানে বসিয়া পড়িল; ভাবিল, "আমার জন্যই লক্ষ্মী আজ যৌবনে যোগিনী, আমিই সাংসারিক ভোগৈশ্বর্য্য হইতে লক্ষ্মীকে বঞ্চিতা—নির্ব্বাসিতা করিলাম।"

মাতুলের আহ্বানে লক্ষ্মীর ধ্যানভঙ্গ হইল। মাতুল বলিলেন, "লক্ষ্মী! এই দেখ, রমানাথ আসিয়াছে, তোমার তপস্যা আজ পূর্ণ হইল। ওঠ মা, আজ আমরা তোমার অতিথি।" অতিমাত্র চমকিত ও বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মী রমানাথের দিকে চাহিল, চারি চক্ষুর মিলনে উভয়ের মর্ম্মস্থল আলোড়িত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া লক্ষ্মী উঠিয়া মাতুল ও রমানাথকে প্রণাম করিল। বহুদিনের তপস্যালব্ধ চির-বাঞ্ছিত অতিথিকে আজ সহসা অভাবনীয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের আতিশয্যে লক্ষ্মী আত্মহারা হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র কুটীরে সে সাধ্যানুসারে আপন ইষ্ট দেবতার অতিথি-সৎকার করিল।

শ্রান্তি দূর হইলে লক্ষ্মীর মাতুল ইন্দুভূষণের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন নির্জ্জন কাননের নিস্তব্ধতার মধ্যে লক্ষ্মী ও রমানাথের নিভৃত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের হৃদয় কাঁপিতেছিল, উভয়েই বহুযত্নে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিয়া রাখিতেছিল। বহুক্ষণ রমানাথকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল "মামীমা কেমন আছেন? এতদিনের পর কি আমার কথা তাঁর মনে পড়িল?" সেই স্বর রমানাথের মর্ম্মভেদ করিল। অপরাধী রমানাথ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে কেমন করিয়া বলিবে যে, লক্ষ্মী তোমার চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া

আজ তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান এবং সে পাষণ্ডের মত আর একটা বিবাহ করিয়া মাতাকে সন্তাপ্তই করিয়াছে। রমানাথের তৎকালীন মানসিক যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠিল। সে অধীরভাবে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে জানাইয়া কৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। শুনিয়া লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখকান্তি ক্ষণেকের জন্য রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া গেল। রমানাথ আবার বলিল "লক্ষ্মী! তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে না? আমার দোষ কি ক্ষমা করিবে না লক্ষ্মী?" নিমেষের মধ্যে আত্মসংযম করিয়া মধুর হাস্যের সহিত লক্ষ্মী উত্তর করিল, "মাতৃ-আজ্ঞায় আমি তোমাকে এতদিন পতিরূপে পূজা করিতেছি, আজীবন পতিরূপেই তোমার আরাধনা করিব। তোমার কোনও দোষ গ্রহণের অধিকার আমার নাই, যাহা হইয়াছে, ভবানীর কৃপায় সমস্তই মঙ্গল হইবে। আমার জন্য তোমরা কেহ আর অনুতাপ করিও না। আমি সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া পরম সুখে ও আনন্দে আছি, ভোগ-বিলাসের সাধ এখন আর আমার কিছুমাত্র নাই। আমি তোমার সহিত যাইব, আমার স্নেহময়ী মাসীকে একবার জন্মের মত শেষ দর্শন করিয়া আসিব।" লক্ষ্মীর মধুর স্বরে রমানাথের ক্ষত হৃদয়ে যেন অমৃতবর্ষণ হইল। দুর্ভাগ্য রমানাথ ভাবিল, হায়! দুই বৎসর আগে কেন লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম না? নন্দালঙ্কারভূষিতা, বিলাসচাকচিক্যময়ী সুন্দরী বেশভূষার মোহিনী প্রতিমা ঢাকিয়া, ক্ষণকালের জন্য রমানাথের মনোমন্দিরে ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মীর শান্তিময়ী, করুণাময়ী মূর্ত্তি দেবীমহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে রমানাথ লক্ষ্মী ও তাহার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল।

৭

বাসন্তীর আর জীবনের আশা নাই, তারিণী বাবু যথাসাধ্য পত্নীর চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু দুঃসাধ্য প্রাণান্তক ব্যাধি কিছুতেই উপশমিত হইল না। কেবল লক্ষ্মী ও রমানাথকে দেখিবার আশায় এখনও বাসন্তীর দেহে প্রাণ আছে। সর্ব্বক্ষণ বাসন্তী জ্ঞানে অজ্ঞানে, জাগ্রতে স্বপনে লক্ষ্মীর নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। তারপর যখন লক্ষ্মী ও রমানাথ আসিয়া মুমূর্ষু বাসন্তীর শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, তখন বাসন্তী বহুক্ষণ নির্নিমেষলোচনে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অশ্রুপূর্ণনয়নে আর্দ্রকণ্ঠে রমানাথ কহিল "মা! এই তোমার লক্ষ্মীকে আনিয়াছি, আর কিরূপে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, বল মা?" বাসন্তী ক্ষীণ হস্ত প্রসারণ করিয়া পুত্রকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর অতি আদরে অতি স্নেহভরে লক্ষ্মীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "এস মা, আমার

গৃহলক্ষ্মী!. তোমার অভাবে আমার সোণার সংসার শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গেল। পাতকিনী আমি, সরলা বালিকা তোমার পবিত্র জীবনের সকল সুখ সাধ হরণ করিয়া তোমাকে যৌবনে যোগিনী সাজাইলাম, মরণেও মা! আমি এ অনুতাপ-যাতনা হইতে মুক্তি পাইব না। তুমি আমায় ক্ষমা কর, মা লক্ষ্মী! নহিলে অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলিয়া মরিব, আমি সত্য পালন করিতে পারিলাম না।" কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মী বলিল, "মাসীমা, অমন কথা বলিও না। তুমি পুণ্যবতী, ভগবান্ তোমার আত্মার শান্তি বিধান করিবেন। আমার জন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখ করিও না, মাসীমা! তোমার কৃপায় আমি মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, সংসারের ভোগে আর আমার কিছুমাত্র আসক্তি নাই, আমি অতুল আনন্দে কাল কাটাইতেছি; তুমি শান্ত হও, আশীর্ব্বাদ কর, এইরূপ শান্তিতেই যেন আমি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।" বাসন্তীর কোটর-প্রবিষ্ট নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল, তিনি অতিকষ্টে একবার উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে রমানাথের হস্তে লক্ষ্মীর হস্ত প্রদান করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন "বাবা রমানাথ! লক্ষ্মীকে আমি তোমার হস্তে প্রদান করিলাম, আজীবন তুমি এই স্বর্ণ প্রতিমাকে সমাদরে রাখিয়া মাতার অন্তিম অনুরোধ পালন করিও।" তারপর বাসন্তী স্বামীর চরণ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তোমার বিনা অনুমতিতে আজ আমি লক্ষ্মীর সহিত রমানাথের বিবাহ দিয়া সত্যপালন করিলাম, দেবতা! এই মৃত্যুকালে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, নহিলে দাসীর গতি হইবে না।" সাধ্বী ভার্য্যার অন্তিমের কাতর প্রার্থনা নিদারুণ গম্ভীরপ্রকৃতি তারিণী বাবুকে বিচলিত করিল। তিনি এখন বুঝিয়াছেন, পত্নীর জীবনব্যাপী বিষাদ ব্যাকুলতার হেতু তিনিই, তাঁহারই নিষ্ঠুরতার ফলে আজ বাসন্তীর জীবনসংশয়। প্রবল অনুতাপে তারিণী বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠে আবার বাসন্তী বলিলেন, "আমার যাহা কিছু ধন ও অলঙ্কারাদি আছে, সমস্তই লক্ষ্মীকে দিলাম; মা লক্ষ্মী! তুমি আমার রমানাথকে ক্ষমা করিও, আশীর্ব্বাদ করি উভয়ে সুখী হও।" লক্ষ্মী ও রমানাথ একত্র মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন।

তারিণী বাবু পত্নীর সংস্কারের নিমিত্ত সেই দিনই গোধূলীলগ্নে লক্ষ্মী ও রমানাথের যথাশাস্ত্র বিবাহ দিলেন। সেই দিনই নিশীথরাত্রে বাসন্তীর পবিত্র দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া গেল।

তারপর লক্ষ্মী মাতুল সমভিব্যাহারে আপনার শান্তিকুটীরে ফিরিয়া গেল। তাহার ধনসম্পদের স্পৃহা নাই লক্ষ্মী বাসন্তীর প্রদত্ত সমস্ত ধন ও অলঙ্কারাদি হেমলতাকে দান করিয়া গেল।

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

কাল।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল জীবই কালের অধীন হইয়া সংসারের ধর্ম্ম রক্ষণ ও পরিচালন করিতেছে। এই ধর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিক এবং জীবের জন্মকাল হইতেই আরম্ভ।

কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে এই কালরূপী মহা রাক্ষসের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য ও ভীত হই।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব বনবাসকালে যম কর্ত্তৃক অনেকগুলি প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কি?' ইহাও ছিল। প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির এই সর্ব্বপ্রাণ-সংহারক মৃত্যুকে লোকে দেখে না, ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

এই মৃত্যুই এই রমণীয় জগতের অসারতা ও নশ্বরতা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়, আমাদের অন্তস্তলের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন পৃথিবীতে ছিন্ন করে ও শোকের বিষাদময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তি ঘোরতর আকারে চিত্রিত করে। মৃত্যুর অনিবার্য্যশক্তি দেখিলে যতই পাষাণ হৃদয় হউক না কেন, ভীত ও বিকম্পিত হইয়া উঠে। পরম জ্ঞানীর চক্ষেও মৃত্যু বিরহ-অশ্রুকণা প্রকটিত করে। মৃত্যুর করাল কবল হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে ইহার সর্ব্বত্র গতি। জগতে যদি মৃত্যুর আধিপত্য না থাকিত, তবে রোগ-শোক-জরাক্লিষ্টের শান্তি কোথায় হইত? তাই বুঝি বিধাতা সর্ব্ববিধ্বংসকারী মহাকালকে অবনীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

কিন্তু আমরাত মৃত্যুর ছায়াকে মহা অমঙ্গলকারী জ্ঞান করি। যখন অকালে মাতার ক্রোড় হইতে পুত্র, পত্নীর হৃদয় হইতে স্বামী, ভগিনীর প্রাণ হইতে ভ্রাতা, সন্তানের স্নেহ হইতে পিতা মাতাকে বিচ্যুত করিয়া অকালে তাহাদিগকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করেন, তখন কায়মনোবাক্যে এই মহা ভীষণ মৃত্যুর উচ্ছেদ প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারি না। নিজজনের বিয়োগে আমরা সৃষ্টির কঠোর নিয়ম সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু বিধাতার নিয়ম অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয়। মানবচিত্ত স্বার্থপর—মায়াশীল। নিজের শরীর মন ও আত্মার তুষ্টি পুষ্টি সাধন ইহার উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে থাকি আর স্বর্গেই যাই, আপন সুখসাধন জীবের প্রধান কার্য্য। দান ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় নীয় সুখের জন্য। ভগবানে চিত্তার্পণ—তাহাও স্বকীয় মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য। তাই জগতে আপনাকে লইয়া এত সুখ ও দুঃখ, এত হাহাকার। যে বস্তুটি লইয়া আমার সুখ, তাহার অভাবেই পীড়া। সেই জন্য সংসারে বিধাতা মায়াবন্ধন

গ্রথিত করিয়া একজনকে অপরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, এই মায়াই সুখ দুঃখের সহচরী। "কাল" যখন আসিয়া জীবের প্রতি কটাক্ষ করে, মায়া স্বীয় সুকুমার অঞ্চলে তাহাকে আচ্ছাদিত করিতে চায়।

আমরা নিশ্চিত, নিরুপায় ও ধ্রুব সত্য জানিয়া এত আকুল হই কেন? মরমের অন্তস্তল হইতে বেগে প্রবাহ ছুটিতে থাকে, আশাময় অন্তর্দাহ কোটি কোটি শিখা প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। সৃষ্টির বিধান গ্রাহ্য করিতে সমর্থ হই না, বিধাতাকেও চিনিতে পারি না। তাই কালের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি এত নিদারুণ দেখি। যদি মানবের অন্তঃকরণ সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্যের অখণ্ড প্রভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে আর কালের গতি বলিয়া পরিতাপ ঘটে না—প্রভুর আজ্ঞা বলিয়া শোক করিবার কারণ থাকে না। কিন্তু মায়া আসিয়া মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া ভুলাইয়া দেয়। তাই আমরা অন্ধ ও অজ্ঞান হইয়া তাহা দ্বারা পরিচালিত হই। কালের গতিবিধি কেহই নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তাহার প্রভাবই কেবল পরিলক্ষিত হয়।

নিরাকার হস্তপদবিহীন কাল অলক্ষ্যে আসিয়া বিরলে বিরলে আপনার কার্য্য করে। মর্ম্মে মর্ম্মে মানব সেই আঘাত ভোগ করেন। সে ব্যথা নয়নের দৃশ্য নহে, বাক্যেরও বর্ণনীয় নহে; শুধু মানস ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয়। আর দুঃখের বেদনা কেবল অশ্রুজল হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করে। কালের আঘাত কালেই মন্দীভূত হয়, তথাপি এককালে নির্ম্মূল হয় না। সেই ঘোরকৃষ্ণবর্ণা রেখা চিতাশয্যায় চিতাবহ্নির সহিত দগ্ধ হইয়া ধূমরূপে গগনমণ্ডলে ওত-প্রোতভাবে বিরাজিত থাকে। ইহার ঔষধ মায়ার ভাণ্ডার এ সংসারে নাই। তবে যদি আমরা ইহলোকের দুঃখময় জ্ঞান ছাড়িয়া পরলোকের বিষয় দেখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে শান্তির শীতল ছায়া দূরে প্রতিভাসিত হইবে।

আষাঢ়ের চাঁদ।

কেন গো বিষাদে লুকায়ে বদন
রয়েছে চন্দ্রমা! নীরদ-মাঝ?
মধুর আননে নাহিক সে হাসি,
বল কি বেদনা হৃদয়ে আজ?

নয়ন আসারে তিতিছে বসুধা,
ভ্রমিছ আঁধারে মলিন বেশে।
প্রেম-পাগলিনী কুমুদিনী পানে,
কেন না চাহিছ মধুর হেসে?

কোথা সে তোমার যৌবনী বসন?
নক্ষত্রভূষিত সুন্দর মুখ?
কোথায় লুকাল সে চারু সুষমা!
হেরিয়ে তোমারে বিদরে বুক।

বিপদে তোমায় কেহ না সম্ভাষে,
চকোর চকোরী না'ক পাশে।
উদাস পরাণে ভ্রমিছ একাকী।
সম্পদে সবাই নিকটে আসে।

বুঝেছি বুঝেছি নিয়তি-পীড়নে,
চিরস্থায়ী কোথা নাহিক সুখ।
আজি সেই রাজা—কাল সে ভিখারী,
তাইত তোমার এতেক দুখ।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

অদ্ভুত গোলোহন।

উপরে কিসের ছবি দেখিতেছ? একটা শৃগাল ও পক্ষে দুইজন বলবান্ পুরুষ শিং ও লেজ ধরিয়া দুই বিপরীত দিকে এমন জোরে টানিয়া ধরিয়াছে যে,

তাহার নড়িবার চড়িবার সাধ্য নাই। আর এক ব্যক্তি এক প্রকাণ্ড পাত্র লইয়া ঐ গরুর দুগ্ধ দোহনে নিযুক্ত। সে এমন কসিয়া দুহিতেছে যে, সব শুষিয়া লইবে, ছিটা ফোঁটা দুধও রাখিবে না। দুধ সকলি তাহার প্রাপ্য, বলবান্ দুইটি লোক গাভীর অধিকারী হইয়াও দুগ্ধদোহনের সাহায্য করিতেছে। এই দোহনে গাভী ক্রমে শীর্ণ ও মৃত হইয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে দোহনকর্ত্তার কোনও ক্ষতি নাই, সাহায্যকারিদ্বয়েরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। কিন্তু তাহারা দুইজন পরস্পরের প্রতি রাগান্ধ, এইজন্য আপনাদিগের হিতাহিত বুঝিতে পারিতেছে না। যখন গরুটী নিতান্ত রক্তহীন হইয়া মুমূর্ষু হইবে, তখন তাহাদের চৈতন্য হইবে, কিন্তু তখন গরুকে বাঁচাইবার আর উপায় থাকিবে না।

পাঠকপাঠিকাগণ! এই চিত্রের প্রকৃত মর্ম্ম কি বুঝিয়াছেন? একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। গাভীটীর অর্থ দুই ভ্রাতার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি ইহা লইয়া তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা আদালতের শরণাপন্ন। উভয়েরই ভিন্ন পরস্পরকে জানাইবে। এক বুদ্ধিমান্ এটর্ণী এই সুযোগ পাইয়া উভয়কে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিতে বলিতেছেন এবং নিজে যথেষ্ট ফি (fee) আদায় করিয়া লইতেছেন। সম্পত্তির অধিকারীরা যত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মকর্দ্দমা চালাইতেছেন, এটর্ণী ততই সম্পত্তি দোহন করিয়া অর্থ শোষণ করিতেছেন। অবশেষে মকর্দ্দমা-খরচেই ধনী দুই ভ্রাতা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, এটর্ণীর পেট ভরিল। ইহারা আপোষে বিবাদের মীমাংসা করিলে এবং ভাই বলিয়া পরস্পরের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে এ দুর্গতি ঘটিত না—তাঁহাদের সম্পত্তি বজায় থাকিত এবং পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবও রক্ষা পাইত।

আদালতের মোহজালে পড়িয়া কত ধনিদি রাজসংসারও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মকর্দ্দমাপ্রিয় ধনিগণ ইহা হইতে যেন বিশেষ শিক্ষালাভ করেন।

বঙ্গ মহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

(৫২৬ সংখ্যা—৪৯ পৃষ্ঠার পর)।

আমাদের সঙ্গে একজন বুদ্ধিমান্ পাহাড়ী ছিল, রাত্রির অবস্থানের উপযুক্ত একটী স্থান দেখিবার জন্য তাহাকেই অগ্রে পাঠান গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমরা ক্রমেই ঘোর দুর্গম পথে প্রবেশ করিলাম। পথ বলা যাইতে পারে, এমন

কিছুই নাই। বর্ষার জলে সৌত হইতে হইতে স্থানে স্থানে গভীর গর্ত্ত হইয়াছে। কখন তাহাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের মূল অবলম্বনে উপরে উঠিতেছি। স্থানে স্থানে ভীমকায় বৃক্ষ পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা কখনও লম্ফ দিয়া, কখনও নীচের ছুড়ঙ্গের পথে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছি। কাপড় জুতা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে। সহযাত্রী একটী মহিলা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কোন মতেই চলিতে পারেন না। তাঁহার সঙ্গে ৩ জন যাত্রী পশ্চাতে রহিলেন। ৩ টী মহিলা পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছেন। আমি ডাণ্ডি-ওয়ালা-গুলিকে লইয়া সেই বনপথে চলিতেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ডাণ্ডিওয়ালাদের সঙ্গে চলিতে পারিলাম না। তাহারা অনেক আগে চলিয়া গেল। কত ডাকিয়া উত্তর পাই না। সেই নিবিড় জঙ্গলে আমি একাকিনী জঙ্গল ভেদ করিয়া দক্ষিণে কি বামে অগ্রসর হইব জানি না। এখন গৃহে বসিয়া সেই অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে কম্পিত হইতেছি, কিন্তু তখন মনে এমন এক অপূর্ব্ব সাহস জন্মিয়াছিল যে, তাহার বলে এই প্রতিকূল অবস্থাতেও বিচলিত হইয়া পড়ি নাই। দিবসেও যে দুর্গম পথে চলা ভার, রাত্রির অন্ধকারে সে পথে কি কষ্টে একা চলিতেছি, তাহা বর্ণনীয় নহে। একটু শব্দ শুনিলেই আশঙ্কা হয় যে, ভল্লুক বা ভালুক আসিতেছে। ভালুকের দৌরাত্ম্যের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম, তাই ভালুকের কথা মনে পড়িতেছিল। ২।৩ মাইল এই ভাবে চলিতে চলিতে অগ্রগামী মহিলাদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যেন মৃতদেহে জীবন পাইলাম। রাত্রিটা এই ঘোর জঙ্গলে বন্যজন্তুদের সহিত কাটাইতে হইবে ভাবিতেছি। পথশ্রমে এতই ক্লান্ত যে, আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, তথাপি সহযাত্রী মহিলাদের আশাজনক কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম, ঘোর অন্ধকারে কোথায় যাইয়া পড়িব, ঠিক্ নাই। হঠাৎ দূরের আলোক দৃষ্টে প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল। আমাদের লোকেরাই যে বুদ্ধি করিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিতেছে, তাহাতে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম। পশ্চাতের যাত্রীদের জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম একটী লণ্ঠন দিয়া ৩ জন লোককে তাঁহাদের অনুসন্ধানে পাঠান গেল। এদিকে আলো হস্তে লইয়া আমরাও অগ্রসর হইতেছি। সম্মুখে একটু সমতল ভূমি দেখিয়া তথায় রাত্রি কাটাইব স্থির করিয়া কম্বল পাতিয়া বসিলাম। সহযাত্রী মহিলাগণ তখনও আশ্রয়স্থান পাইবার আশা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা কতকদূর যাইয়াই আমাকে আহ্বান করিলেন। এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উঠিতে ইচ্ছা হয় না; তথাপি অগ্রসর হইলাম। একটী কুটীরা রমণী সহাস্য মুখে হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে তাহার বাঁশের কুটীরে লইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত আতিথ্যলাভ করিয়া অবাক্ হইলাম। গৃহখানি কেবল বাঁশে গঠিত, অধিকাংশ স্থান শস্যে পূর্ণ। বসিতে

স্থান পাইয়া যে আরাম বোধ হইল, বলিবার নহে। এখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সহযাত্রীদের জন্যই যত চিন্তা হইতেছে। প্রায় একঘণ্টার পর সকলেই নিরাপদে আসিয়া পঁহুছিলেন। দীর্ঘকাল পরে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎলাভে যত'না আনন্দ জন্মে, ৯ জন সহযাত্রী একত্রিত হইয়া তদপেক্ষা আনন্দিত হইলাম। এত ক্লান্তির মধ্যে আহার-চিন্তা আসিল না। শয়নের একটু স্থান পাইলেই কৃতার্থ হই। আশ্রয়দায়িনী ভুটীয়া নারী আমাদিগকে সুখী করিতে কত ব্যস্ত! মুখ ধুইবার জল ঢালিয়া দিতেছে। আহারের কথা বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, যেন আমরা কুটুম্বভাবে আসিয়াছি। আমরা প্রথমে আহারের অনিচ্ছা জানাইলাম, সে কিছুতেই ছাড়িবে না। অবশেষে ৬ সের আলু সিদ্ধ ও ৩ সের চমরী গরুর দুধ আনিয়া দিল। সঙ্গে কিছু মাখন সম্বল ছিল, তাহার সাহায্যে সেই সিদ্ধ আলু যে তৃপ্তির সহিত আহার করা গেল, বর্ণনা করিতে পারি না—রাজভোগেও এত তৃপ্তি হয় না। এখন শয়নের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইলাম। একখানা কম্বল ঝুলাইয়া কুটীরের সেই সঙ্কীর্ণ স্থান দুই ভাগ করা গেল এক অংশে পুরুষগণ ও অন্য অংশে আমরা ৬টী মহিলা আশ্রয় লইলাম। পথের কথা বলিতে বলিতে আমাদের মধ্যে হাসির লহরী উঠিল। আজ জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। যে নূতন অবস্থায় পড়িয়াছি তাহা চিন্তা করিতে করিতে একবারও নিদ্রা আসিল না। কলিকাতার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী হিমালয়ের ঘোর জঙ্গলে ভুটীয়া-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব, কল্পনাতেও ভাবিতে পারি নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এই প্রতিকূল অবস্থাতেও মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই, বরং নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

নূতন সংবাদ।

১। অজিত সিং অমৃতসরে লুক্কায়িত ছিলেন, ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হইয়াছে।

২। জাপানে টোকিও শিল্পপ্রদর্শনী মহা সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। দর্শনী কি দশ পয়সা মাত্র। প্রতিদিন ৫০ সহস্র দর্শকের সমাগম হইতেছে।

৩। বিলাত-ভ্রমণকারী সিকানীর ও আলোয়ারের মহারাজা এবং গণ্ডোলের ঠাকুর ইউরোপ আফ্রিকে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

৪। বিগত ১৯ শে জুন রাত্রিকালে বরিশালে ভীষণ বাত্যা হইয়া গিয়াছে। ঝড় অতি প্রবল বেগে বহিয়াছিল এবং প্রায় বার ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ঝড়ের প্রকোপে অনেক বড় বড় গাছ ও বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

৫। মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব চীফ জজ ও অস্থায়ী দেওয়ান টি. আর. এ. শঙ্কু মেনন, সি. আই. ই. মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

৬। বিগত ২৩শে জুন, সোমবার, কলিকাতা সহরে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেক বড় বড় গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। গাছ পড়িয়া তার কাটিয়া যাওয়াতে কোন কোন রাস্তায় ট্রামগাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বামারচনা।

"কি যেন গো নাই।"

কি যেন গো নাই, এ পরাণ তাই
হয়েছে অধীর প্রায়।
কে যেন গো ছিল, কোথা চলে গেল
করি সব শূন্যময়।
যেন কোন সুরে নিকটে কি দূরে
বাজিল মোহন বাঁশী।
নয়ন মেলিতে যেন সে চকিতে
কোথায় গিয়াছে মিশি।
ছায়ার মতন আসিয়া কখন
গিয়াছে না বলে চলি।
শুন্য সোহা দিয়া যেন মোর হিয়া
কে আজি দিয়াছে ঠেলে।
কে যেন অজানা দিতেছে বেদনা
প্রাণের মাঝেতে থাকি।
দুদিনের তরে এ হৃদি-মাঝারে
উঁকি দিল পিক ডাকি।
নিশাটি পোহাতে অরুণ উদিতে
আমার তরুণ পাখী—
আধ ফোটা ফুল সুবাস আতুল
দিয়ে গেছে মোরে ফাঁকি।
সে যে দেখা নাই মোর প্রাণ তাই
কাঁদেগো বেদনা-ভরে
ব্যাকুল হৃদয় আজ কোথা যায়
ধরিতে হৃদয়ে তারে।

শ্রীমতী সরোজ-কুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

প্রাণপ্রিয় চিদানন্দ হে চিত্ত বিহারী!
কমল শ্রীপদতল স্মরিয়া তোমারি—
এসেছে ভারতে এবে যে পুত প্রবাহ।
স্বদেশী ভাবের মহা পুরিত উৎসাহ।
যেন সে ভাবের নব প্রবাহ আবার,
সগর-বংশের ন্যায় করে হে উদ্ধার;
মোহেতে পতিত বত ভারত-সন্তানে,
কালিমা মোহ-মসী নব শক্তি দানে।
প্রণমি চরণে নাথ! করি এ প্রার্থনা,
দয়া করে পূর্ণ কর দাসীর কামনা।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

আমরা গভীর-শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকাদিগকে অবগত করিতেছি যে, যিনি প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন, বিগত ৪ঠা আষাঢ় (১৯ শে জুন) রাত্রি ১০ ঘটিকার পর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সেবা করিতে নিজের ক্লেশ, রোগ, পারিবারিক বিপদ ও শোক অগ্রাহ্য করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে তাঁহার প্রিয় বামাবোধিনীর কল্যাণ অন্বেষণ করিতেন। অদ্য আমরা তাঁহার অভাবে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি। সে অভাব কেহ পূর্ণ করিবার উপযুক্ত লোক নাই। বামাবোধিনী তাঁহার মানস-কন্যা ছিলেন, এখন তিনি পিতৃহীনা হইলেন।

পাঠকপাঠিকারা আছেন, লেখক-লেখিকারা আছেন, কিন্তু সেরূপ যত্ন করিবে কে? সেই অধ্যবসায়, সেই অকৃত্রিম অনুরাগ কোথায়? স্ত্রীজাতির উন্নতি তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। যখন এদেশে একখানিও স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা ছিল না, তখন তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় ১২৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার এই মহতী কীর্ত্তি ভগবান্ আপনি রক্ষা করিবেন, কিন্তু এক জনের অভাব কিছুতেই পূর্ণ হইবে না।

স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য প্রথমে তিনি অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত করেন। পাঠ্য পুস্তক তিনি রচিত হইত। যে সকল অন্তঃপুরবাসিনীরা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৎসরান্তে তাঁহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত এবং যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইত। আমাদের অনেকের গৃহিণীরা ঐ পরীক্ষা দিতেন এবং পুরস্কার লাভ করিতেন।

যেমন স্ত্রীশিক্ষা তাঁহার জীবনের একটী কার্য্য ছিল, সেইরূপ বালকদিগের শিক্ষার জন্যও তিনি স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসুর সহিত সিটি কলেজ স্থাপন করেন। সেই সময়ে ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয় কলিকাতায় অতি অল্পই ছিল। জীবনের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত তিনি ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান কর্ম্মচারী (Principal) ছিলেন। কিরূপে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে হয়, সিটি কলেজে তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য ছিলেন। বিদ্যাদানই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রথম বয়সে তিনি হিন্দু স্কুল ও স্বদেশস্থ হরিনাভি, নিবাসই স্কুল প্রভৃতিতে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে উমেশচন্দ্র প্রথম বয়স হইতেই উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়, উৎসাহ, নির্ভীকতা এবং বিবেকপরায়ণতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত

তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয়। আমরা ক্রমে সেই সকল প্রকাশ করিব। যখন মতামত লইয়া দেশের জমিদারদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ, তাঁহাদিগকে প্রহার, সমাজগৃহে কালীমূর্ত্তি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করেন। উমেশচন্দ্র অটল পর্ব্বতের ন্যায় সে সকল সহ্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথম হইতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে ঐ সমাজে দীক্ষিতও হইয়াছিলেন। তখন অন্য সমাজ ছিল না। পরে তিনি কেশবচন্দ্রের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ঐ সমাজের একজন অধ্যবসায়ী সভ্য এবং তৎকালীন সঙ্গত সভার সম্পাদক ছিলেন। কুচবিহার বিবাহের পর তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং শেষ জীবন ঐ সমাজস্থাপনাবধি তাহারই সেবায় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না এবং তাঁহার অভাব পূরণ করিবার লোক নাই। সকল বিভাগেই তিনি হৃদয়ের গভীর উৎসাহে কার্য্য করিতেন। তিনি আচার্য্য, কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য এবং সাধনাশ্রমের সেবক ছিলেন। তাঁহার যত্নে সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল।

মূক-বধির বিদ্যালয়ের তিনি জন্মদাতা। প্রথমে সামান্য সূত্রে ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশেষে রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের সহায়তায় এখন তাহার অবস্থা সুন্দর এবং তাহার গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে।

কলিকাতা ও স্বীয় জন্মভূমির অনেক হিতকর কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। দুঃখী দরিদ্রদিগের জন্য অনাথবন্ধু ভাণ্ডার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইরূপ গুণসম্পন্ন পুণ্যাত্মা বৃহৎ পরিবার রাখিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার পুণ্যের পুরস্কারলাভার্থে অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও স্নেহভাজন কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইবে। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে তদীয় শীতলাশ্রয় প্রদান করুন।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৪র্থী শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে পঠিত।

আজ আমাদের পরমপূজনীয় স্নেহময় পিতৃদেব চারি দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া পিতার পিতা পরম পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা মাতৃ-

পিতৃহীনা অনাথা; এ সংসার এখন আমাদের নিকট ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখন আমরা কোন্ পথে যাইব, কিরূপ ভাবে জীবন-পথে চলিব, কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না যে এত শীঘ্র আমাদের ভাগ্যাকাশ এরূপ ঘোর অন্ধকার-মেঘে আবৃত হইবে। পিতার স্নেহ-ক্রোড়ে নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইতেছিলাম। তিনি কত দিন আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য বলিয়াছেন "আমার শেষ হইয়া আসিল, আমি চলিলাম। আমার ডাক পড়িয়াছে।" এরূপ কথা প্রায়ই তাঁহার মুখ হইতে শুনিতাম, কিন্তু আমরা কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারি নাই। আজও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, পিতা আমাদের ছাড়িয়া চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছেন। মনে হইতেছে যেন তিনি কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, আবার আসিবেন। তাঁহার সেই স্নেহ-মাখা মধুর ডাক আবার শুনিব, আবার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিব, তাঁহার মুখের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিব। অহো! আর এ জীবনে তাঁহার দেখা পাইব না, ভাবিতে গেলে হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রেমময়! দয়াময়! চিরদিন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমরা যেন পিতার আদর্শ জীবন ধারণ করিয়া, তাঁহার পদানুসরণ করিয়া, তাঁহার মনের মত হইয়া, প্রেমময়! তোমার প্রদত্ত এই জীবন-পথে চলিতে পারি। তুমি আজিকার এই পবিত্র দিনে আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। এখন তোমার আশীর্ব্বাদ ও আমাদের পরমপূজনীয় পিতা, মাতা ও পিতৃপুরুষদের আশীর্ব্বাদই এ ভগ্ন হৃদয়ের ও অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র ভরসা। আজিকার এই দিনে পিতার বিশেষ বিশেষ গুণের কথা আলোচনা করিয়া, তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আমাদের জীবনকে যেন ধন্য করিতে পারি। তিনি জীবিতাবস্থায় তাঁহার প্রশংসা শুনিলে দুঃখিত হইতেন, তাঁহার লজ্জা বোধ হইত। কিন্তু আজ আর তিনি এ পৃথিবীতে নাই, সুতরাং তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া দুঃখিত বা লজ্জিত হইবেন না। আজ এই মনে করিয়া আমরা তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ গুণের কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আপনাদের জীবনকে ধন্য করিব।

পিতা ১০ বৎসর বয়সের সময় পিতৃহীন হন। অভিভাবক আর কেহ ছিল না। তাঁহার বিধবা মাতা ও ঠাকুরমাতাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অপেক্ষা ২৷৷০ বৎসরের বড় ছিলেন। পিতার তিন সহোদর ও দুই ভগ্নী। ভগ্নী দুটি অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। বাবা প্রথমে দেশের পাঠশালায় পড়িতেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিলে ঠাকুর মা গামের দোলাতে মুড়ি বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইতেন, সেই মুড়িগুলিই প্রাতঃকালের

অনুযোগ ঠাকুর দাদা তাঁহাদের জন্য বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি সামান্য মাহেনার কার্য্য করিতেন, বাড়ীতে অনেক গুলি লোক ছিল, যাহা পাইতেন তাহাদিগকে খাওয়াতেই তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই অল্প আয়ের মধ্যেও তিনি তিনটী পুত্রের জন্য তিন খানি চক লইয়া যাহাতে তাহাদের খাওয়া ও পরা চলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যান। সেই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আমার ঠাকুর মা তিনটী পুত্রকে প্রতিপালন করেন। বাবার নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুর মার অতিথিসেবার প্রতি এরূপ ভক্তি ছিল যে, অনেক দিন এরূপ ঘটিয়াছে, ঠাকুর মা খাইতে বসিবেন এমন সময় এক জন আসিয়া পড়িল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নিজের মুখের ভাত অতিথিকে দিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ঘরে এমন আর কিছু নাই যে সেদিন খান, একটু গুড় মুখে দিয়া দিন কাটাইয়া দিলেন। এরূপ প্রায়ই ঘটিত; কারণ আমাদের পৈতৃক বাসস্থান গঙ্গার নিকটে ছিল, অনেক দূর দেশ হইতে লোকে গঙ্গাযাত্রা করিয়া আসিয়া থাকিত। তাহাদের আহার করান, রোগীর তত্ত্বাবধান করা ঠাকুরমার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। পিতা তাঁহার মাতার নিকট হইতে এই সকল গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

পিতা যেবার বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং পরে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া বৃত্তি পান। সেই বৃত্তির টাকা লইয়া তিনি এফ, এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি নিজে রন্ধন করিয়া খাইয়া ও ২।৪ জন আত্মীয়কে খাওয়াইয়া স্কুলে যাইতেন। তাঁহার উপর প্রাইভেট টুইসনিও ছিল। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিতেন, আসিয়া রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া পড়িতে বসিতেন। শুনিয়াছি, সেই বাড়ীর উপর তলায় যত সব অসৎ লোক থাকিত, তাহারা রাত্রে এরূপ উৎপাত করিত যে, সেখানে এক মুহূর্ত্ত থাকা যেন অসম্ভব মনে হইত। সেই বাড়ীর একতলার একটী ঘরে বাবা পড়িতে বসিতেন, সেই সময়ই উহারা উৎপাত আরম্ভ করিত। বাবা ভাবিতেন এরূপ করিয়া তিনি কখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। যখন তিনি দেশে যাইতেন, তখন তাঁহার উপর বাড়ীর কার্য্য এত পড়িত যে, এক পাতা পড়িতেও তিনি সময় পাইতেন না। এদিকে এরূপ, ওদিকে সংসারের সকল খরচ বাবাকে দিতে হইত। আত্মীয় স্বজন যখন শুনিলেন, বাবা বৃত্তি পাইতেছেন, চাকরি করিতেছেন, একে একে সকলে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। এইরূপে বহু দূর সম্পর্কের কত লোক আসিয়া জুটিল। ঠাকুর মা কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। তাহারা থাকিয়াই গেল।

এণ্ট্রে এ, পাশ করিয়া বাবা ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পড়িয়া ডাক্তারি ছাড়িয়া দেন। সেই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। শুনিয়াছি, অক্ষয় বাবুর লেখাই তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আকর্ষণ করে। ২৫ বৎসর বয়সের সময় পিতার বিবাহ হয়। তখন প্রথম ব্রাহ্মানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতেছে। বাবা স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হইবে। তখন এরূপ কোন নিয়ম পদ্ধতি হয় নাই, ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। মার বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই বিবাহ দেন।

বি, এ পাশের পর হিন্দু স্কুলে বাবার প্রথম কাজ হয়। পরে নিবারই ও অন্যান্য স্থানে কার্য্য করেন। এ সকলের মধ্যে হরিনাভিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিনাভি ইংরাজি বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সিটি স্কুল ও যুক্ত-বনিয়-বিদ্যালয়ও তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যও তিনি অনেক করিয়াছেন। এখানে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে দিন শেষ হইয়া যাইবে। সেই জন্য সংক্ষেপে তাঁহার বিষয় কিছু বলিব।

পিতার মনের বল অসাধারণ ছিল। প্রথম যখন তিনি ব্রাহ্ম হন, দেশের লোক সকলে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে, এমন কি দেশের জমিদারেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে শাস্তি দিবার (জব্দ করিবার) জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। শুনিয়াছি, বাবার ঠাকুর মা যখন মারা যান, তখন জমিদারেরা ও অন্যান্য সকলে দোকানদারদের নিষেধ করিয়া দেন যে, কেহ যেন তাঁহাদের কাঠ বিক্রয় না করে ও তাঁহাদের বাড়ী না যায়। বাবা বলিয়াছিলেন যে, তিনি সমস্ত দোকান ঘুরিয়াছিলেন, কেহ কাঠ দিল না; রাত্রি হইয়া গেল, একটা লোক, কি কাঠ কিছুই পাইলেন না। তখন তাঁহার জেঠা মহাশয় অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি দেশের লোক আমাদের জব্দ করিবে? আচ্ছা দেখি কিরূপে তাহারা আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করে।" এই বলিয়া তিনি একখানি কুঠার লইয়া, বাবাকে সঙ্গে করিয়া, আপনাদের বাড়ীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে একটা বড় গাছ কাটিয়া আনিয়া ঠাকুরমাকে দাহ করিলেন। তখন সমস্ত দেশের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার পর শ্রাদ্ধের সময়ও অনেকে বাধা দেয় ও গোলযোগ উপস্থিত করে। বাবা শেষে কলিকাতা হইতে উপাসক ও বন্ধুদিগকে লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাহার পর হরিনাভি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিবার সময় কত কষ্ট যে ভোগ করিয়াছেন, বলা যায় না। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য অতি আশ্চর্য্য ছিল। প্রথমে একটী

ঘরে ব্রহ্মোপাসনার স্থান ঠিক করেন। সেখানে তাঁহার ২।১ টী বন্ধু ও ছাত্রেরা আসিয়া উপাসনায়যোগ দিতেন, ইহাদেখিয়া দেশেরলোকের বড় ভয় হয় তাহারা এরূপ কার্য্য দেশে যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করে এবং বাবাকেও এরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করে। তাহাতেও যখন উহা বন্ধ না হইল, তখন তাহারা ভয় দেখাইতে লাগিল। পিতা পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং এখানকার ২১ জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক সপ্তাহে উপাসনা করিতে যাইতেন। দেশের লোকেরা দেখিল, দেশ হইতে উঁহাকে তাড়াইয়াও কার্য্য বন্ধ করিতে পারিল না। পরিশেষে একদিন উপাসনা হইতেছে এমন সময় কতকগুলি লোক ভয়ানক গোল মাল করিয়া উপাসনা ভঙ্গ করিয়া দেয় এবং যে সকল ছাত্র আসিয়া যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে মার পিট করে। পর সপ্তাহে বাবা গিয়া দেখেন উপাসনাগৃহের মধ্যে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহার সেবার জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। সেখানে যে ব্রহ্মোপাসনা হইত তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বাবা ও তাঁহার বন্ধুগণ গিয়া উপাসনা-গৃহের দাবী করাতে, তাহারা অম্লান বদনে বলিল এখানে কোন কালে ব্রাহ্মসমাজ ছিল না, এটা আমাদের চির কালের কালীমন্দির, তোমরা চলিয়া যাও। পরে প্রতিবেশী লোকদিগকে ডাকিয়াও ব্যাপারটী বলা হইল, তাহারাও বলিল আমরা জন্মিয়া অবধি উহা কালীর মন্দির জানি, তথায় ব্রাহ্মসমাজ কোন কালে ছিল না। পিতা নিরুপায় হইয়া চলিয়া আসিয়া ভাবিতেছেন কি করিবেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিল যে, আপনাকে বাবু ডাকিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যত দিন না অন্য কোন স্থলে উপাসনার স্থান ঠিক হয়, তত দিন তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা করিবেন ও এইখানেই আহার করিবেন। বাবা ইহা ভগবানের বিশেষ দয়া মনে করিয়া, সানন্দচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, তথায় চলিলেন। তথায় সেই বন্ধু অতি যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপাসনার স্থান করিয়া দিলেন এবং উপাসনান্তে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইলেন। যত দিন অন্য স্থান না পাইলেন, তত দিন সেই স্থানেই উপাসনা চলিল। আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা প্রথমে তাঁহাদের বিরুদ্ধে থাকিয়া সমাজ উঠাইয়া দেন, শেষে তাঁহারাই আবার ব্রাহ্ম সমাজ নির্ম্মাণের ভূমিদান করেন ও উহা প্রস্তুত করিবার সময় সাহায্য করেন।

পিতা যাহা করিবেন বলিতেন, তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। ১২ বৎসর বয়সের সময় তিনি মৎস্য ত্যাগ করেন। একবার তাঁহার ভয়ানক অসুখ হয়, কবিরাজ সিঙ্গিমাছের ঝোল ও ভাত খাইতে বলেন। তাহাতে তিনি কিছুতেই সম্মত হন না। ইহা দেখিয়া ঠাকুর মা লুকাইয়া মাছের ঝোল রাঁধিয়া তাহা ছাঁকিয়া খাওয়াইতে যান। বাবা ভাত

মাখিবা মাত্র বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি মাছের ঝোল আমাকে দিয়াছ, আমি ভাত পাইব না। ঠাকুর মা শেষে মিথ্যা কথা কহিলেন; বলিলেন, না মাছের ঝোল নয়, মাছের ঝোল কি এইরূপ হয়। বাবা কিছুতেই তাহা খাইলেন না। তখন পুনরায় নিরামিষ ঝোল করিয়া তাঁহাকে খাওয়ান হয়।

তিনি যে সকল মহৎ কার্য্য করিতেন, তাহা কাহাকেও জানাইতেন না। নিজে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি কখন চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" পিতা নিজের জীবনে ইহা সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কত শত অনাথার দুঃখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা

তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। তিনি রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না, ইহা কাহাকেও বলেন নাই। একদিন রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই আমি এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। প্রাতঃকালে যখন উপাসনায় আসি, তখন জিজ্ঞাসা করেন, রাত্রে কি তোর ঘুম হয় নাই? আমি আশ্চর্য্য হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম কেন? তখন বলিলেন, তোর কথা শুনিতে পাই, তুই এধর ওধর করিস, শব্দ পাই। আমি শুনিয়া ত অবাক্। বলিলাম কেন তোমারও কি রাত্রে ঘুম হয় না? তখন বলিলেন হাঁ আর দিন কতক হইল রাত্রে ঘুম হয় না, আর বড় গা জ্বালা করে। ইহা শুনিয়া আমরা সকলে বড় চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাকে একটু বিশ্রাম লইবার জন্য অনুরোধ করিলাম

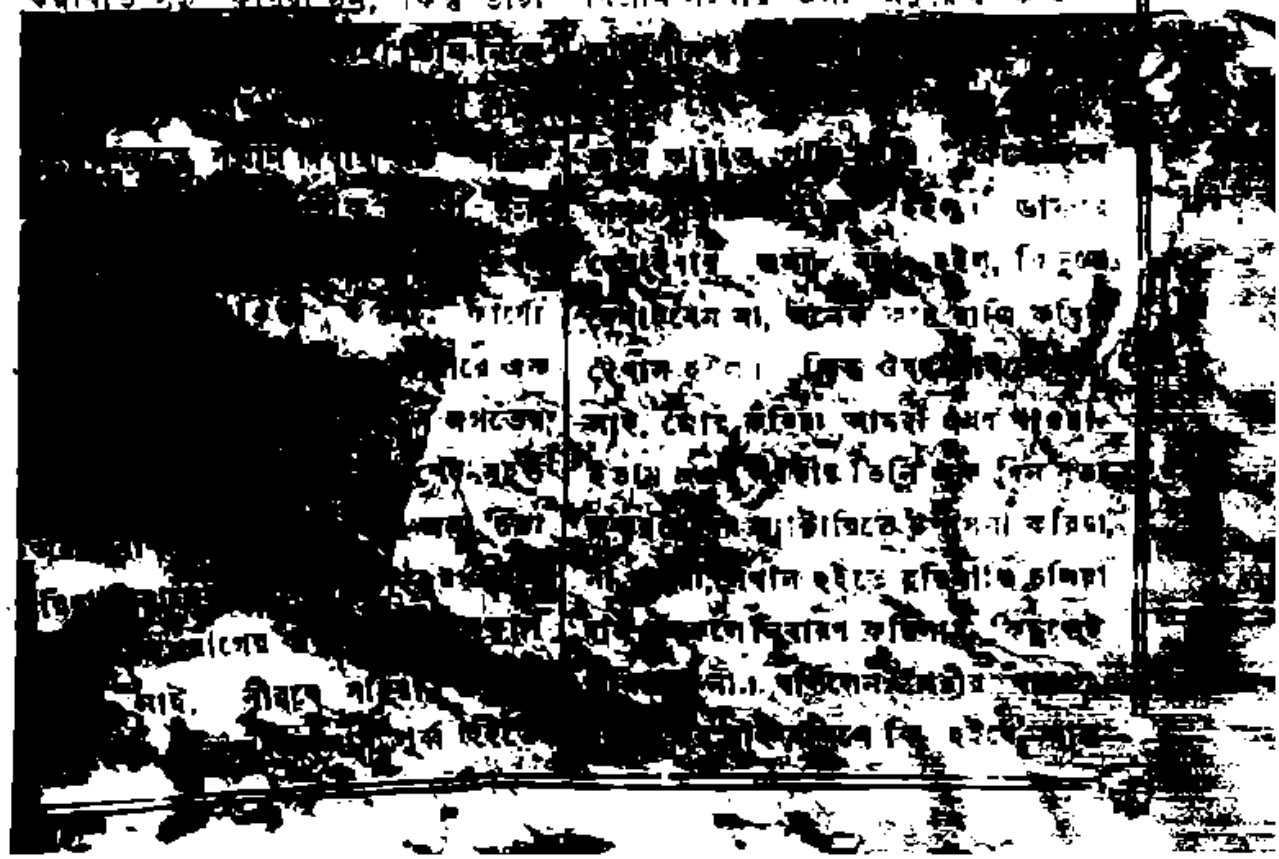

কয় সপ্তাহ বসিয়া আমি নমাজে উপাসনায় যোগ দিতে পারিতেছি না, আজ যাইবই।"

দার্জ্জিলিং যাইবার দিনকতক পূর্ব্বে সাধু যখন ভয়ানক যাতে, উপর হইতে নীচে নামিতে কিম্বা দুই এক পা চলিতে গেলেও ঘুরিয়া পড়িতেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি ছিল না। মহলানবিস মহাশয় মটর গাড়ি চাপা পড়িয়াছেন শুনিয়াই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ঐরূপ অবস্থাতেই হাঁটিয়া গেলেন, গাড়ি আনিতে দিলেন না। তাহার পরও আবার বিবাহের রেজিষ্টারি করেন।

দার্জ্জিলিং গিয়া, তিনি বেশ দিন মাত্র ভাল ছিলেন যখন তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে কাঁদিতে লাগিলাম। [illegible]

কিছুই নয়, পাতলা জিনিসযাহা কিছু পায়, গলায় ঢালিয়া দিলেই খাইব। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। যখনই ডাকিয়াছি, তখনই চাহিয়া দেখিয়াছেন। সোমবার বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, মঙ্গল বার একটু ভাল ছিলেন, বুধবার সকাল হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং ধীরে ধীরে নীরবে এ পৃথিবী ত্যাগ করিলেন। অনেক মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ কখন দেখি নাই। তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে ঠিক যেন মনে হইতে লাগিল, তিনি মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার শরীরের এই অসহ্য যন্ত্রণা যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। একটু একটু করিয়া মহাযোগী মহাযোগ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

অহো! বাবা আজ কোথায়! আজ আমাদের গৃহ শূন্য। আর আমাদের হৃদয়

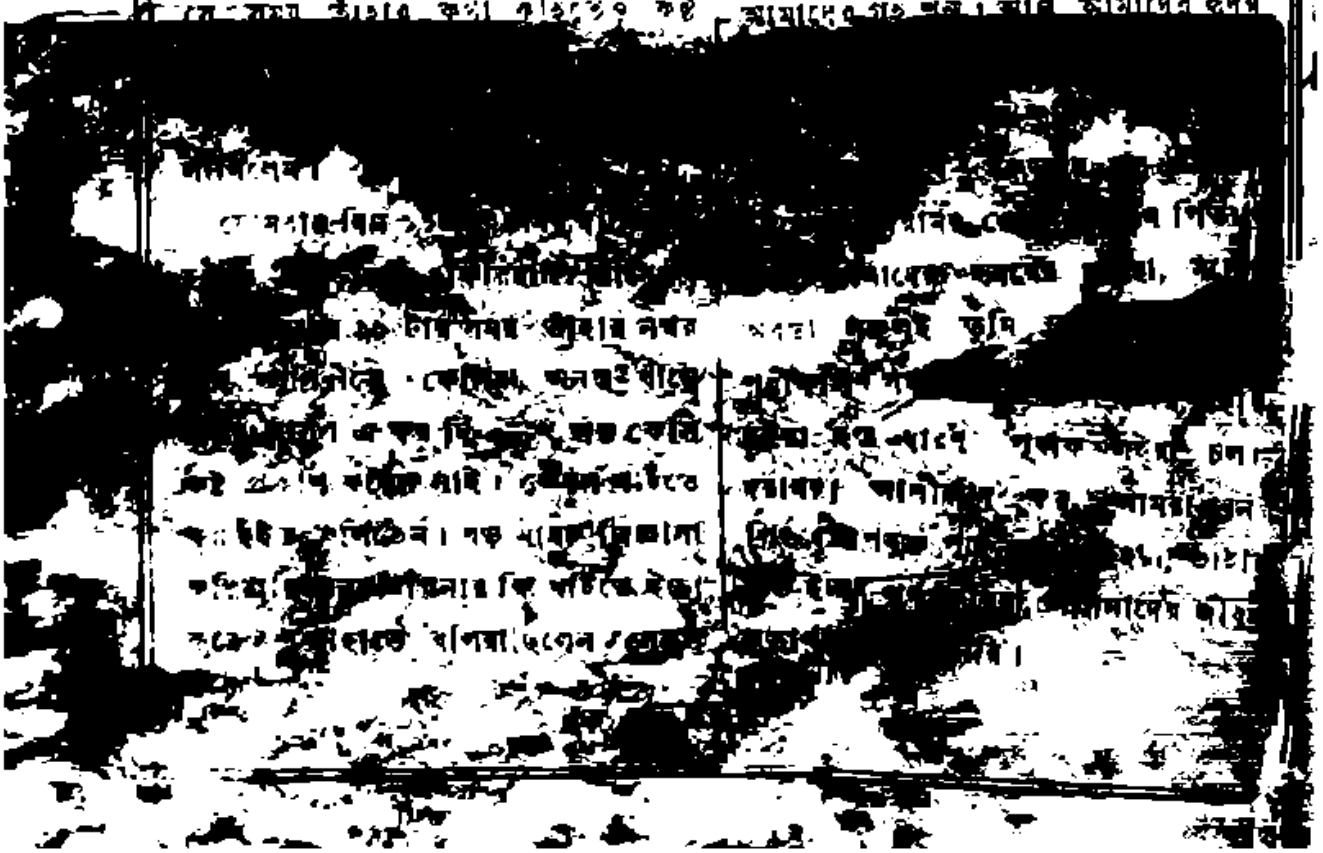

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 536. ১৩০৪

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ কল্প ৫৩৬ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩১৪। এপ্রেল, ১৯০৮। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পশ্চিমাঞ্চলে বৈশ্য কন্‌ফারেন্স—এ বর্ষের বৈশ্য কন্‌ফারেন্স মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে উক্ত সভায় এবার অনেকগুলি উপায়ের প্রস্তাব উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। বৈশ্যজাতি নানা শ্রেণী, নানা সম্প্রদায়ে ও নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। তাহাদের শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত সমস্ত পার্থক্য দূরীকৃত করিয়া, যাহাতে সমগ্র বৈশ্যজাতি একজাতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে সামাজিক কুপ্রথা সকল অপসৃত হয়, যাহাতে সামাজিক ও পারিবারিক, ধর্ম্মঘটিত বা বিষয়ঘটিত বিবাদ-বিসংবাদের সালিসী [illegible] নিষ্পত্তি হয়, যাহাতে সংস্কৃত ও হিন্দি [illegible] উন্নতি হয়, যাহাতে [illegible] স্ত্রীশিক্ষা [illegible] পারিবারিক [illegible] বিধবারা স্বধর্ম্মভাবে অন্নগ্রাসিতা ও বিবিধ শিল্পাদি বিদ্যায় শিক্ষিতা হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, সেই সকল সদনুষ্ঠানই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বৈশ্যজাতিমধ্যে বিবাহাদি উৎসবে বারবনিতার নৃত্যগীতাদি-প্রথা প্রচলিত আছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলে সমবেত হইয়া ইহা দর্শন ও শ্রবণ করেন, এই কুপ্রথার উচ্ছেদ বিষয়ে, এই বৈশ্য-সভা এবার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বৈশ্য বালকেরা যাহাতে শিল্প বাণিজ্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্যজাতির অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক সমুন্নত প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারে, ধনাগমের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারে, তৎপক্ষেও এই সভার আন্তরিক উদ্যোগ। ঈশ্বর এই সভার সাধু উদ্দেশ্য সফল করুন।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসৃত হউক।"

ভারতের সর্ব্বজনীন বিরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়—আজি মঙ্গলময়ের কৃপায় দেবী এনি বেসান্তের মহীয়ান্ সঙ্কল্প ফলোন্মুখ হইল। বহুদিনাবধি তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল যে,—ভারতবর্ষে একটী জাতীয় বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং উহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার ভারত-সন্তানগণের হস্তে ন্যস্ত হউক। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান্, ব্রাহ্ম, শিখ, জোরোষ্ট্রিয়ান্ প্রভৃতি যে জাতির যত বিদ্যালয় আছে, সমস্তই অবিরোধে সম্মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্যে এই বিরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক একটী অঙ্গস্বরূপ হউক। ভারতের মস্তিষ্কস্বরূপে সর্ব্বপ্রকার সম্প্র-দায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সাধনা ও চিন্তার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের এই বিশ্ববিদ্যালয় হউক। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নেতারা সমপ্রাণ সহোদরের ন্যায় সৌহার্দ্দ মিলিত হইয়া ইহার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হউন।

এ ব্যাপার অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবি-রত্ন মহাশয় তাঁহার "অকিঞ্চনের নিবেদন" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—"আমরা সকলেই এক মায়ের (জন্মভূমির) সন্তান। এই ভারতবর্ষীয়ত্বে আমাদের ঈশ্বরদত্ত—পৈতৃক ও মাতৃক স্বত্ব, জন্মাধীন স্বত্ব, স্বাভাবিক স্বত্ব, আমাদের কৌলিক ও সৌলিক স্বত্ব; আমাদের অস্থি, মাংস, মজ্জা, শোণিত, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ, সকলি এই মাতৃভূমির উপাদানে সৃষ্ট ও পুষ্ট। এই ভূতধাত্রী যখন আমাদের সাধারণ জননী এবং এই ভূতধাত্রীর স্রষ্টাও যখন সেই—"একমেবাদ্বিতীয়ম্", তখন আমরা সকলেই এক পরিবার। অতএব অসংখ্য বিষয়ে আমাদের অসংখ্য ভেদ থাকিলেও, আমাদের সাধারণ সন্মিলন বা সংযোগ-ভূমি—ঈশ্বর ও জন্মভূমি। ঈশ্বরে ও জন্ম-ভূমিতে যদি সকলের অনুরাগ অচল হয়; জন্মভূমির সমুন্নতিই যদি সকলেরি অদ্বৈত লক্ষ্য ও অদ্বৈত সাধনা হয়; আমরা যদি ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া একই—মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবই; পথে কোনও বিঘ্নবাধা আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। যেমন সাগরোন্মুখী নদীরা নানা পথে প্রবাহিত ও নানা বাধায় প্রতিহত হইয়াও, সেই মহাসাগরেই পতিত হয়, তেমনি, আমরা ত্রিশ কোটি, সমপ্রাণ ও একলক্ষ্য হইয়া চলিলে, সহস্র বাধা সত্ত্বেও আমাদের সিদ্ধি-ক্ষেত্র—সেই মহাসঙ্গমে গিয়া মিলিব।"

বেসান্ত দেবী এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করি-বার জন্য যাহা করিয়াছেন ও যাহা করি-তেছেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইংলণ্ডেশ্বর, তদীয় প্রধান মন্ত্রী, ভারত-সচিব, ভারত গবর্ণর, ভারতের নানা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান নেতা প্রভৃতিকে তিনি নিজ উদ্দেশ্য জানাইয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে অনুমোদন না করিয়া কেহই থাকিতে পারেন না।

অগ্নি বেসাণ্ট বক্তৃতাকালে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—সমগ্র ভারতবর্ষ যাহাতে ভারতবাসীর স্বায়ত্বশাসনতন্ত্রে পরিণত হয়, তাহার জন্য এখন হইতে আমাদিগকে উদ্যোগী হইতে হইবে, কেননা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, সমগ্র জগতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে একটী বিশ্বজনীন মহাসম্মিলনের শুভদিন আসিতেছে। এসময় যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হস্তে দেন, তবে এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই উক্ত মহাসম্মিলনের প্রথম পথপ্রদর্শকরূপে চিরকাল পূজিত হইবেন এবং ব্রিটিশ জাতির পুণ্যমহিমা এই জগতে অক্ষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে স্বাধীনতার উপাসক টেজীয়ান্ ব্রিটিশ জাতির উদ্যমে এমেরিকার ঘৃণিত দাসত্বপ্রথা নিবারিত হইয়াছে, যাঁহাদের শিক্ষায় ও আদর্শে আজি এদেশে স্বদেশভক্তির নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এ অধম পতিত মহাজাতির উদ্ধারসাধন তাঁহাদেরি দায়াধীন।

এ জগতে দেবী আনিবেসাণ্টের উদয়, ভারতের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপার ফল। কোটি কোটি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি অনন্তকাল জীবিত থাকিবেন। এ পতিত জাতির উদ্ধারসাধনের জন্য তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ পতিতপাবনী মহাশক্তিরূপে প্রেরিতা।

দান—বহরমপুরের স্বনামখ্যাত জমিদার রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সাহেব বহরমপুর হাসপাতালে বিনা ব্যয়ে রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য ৪০,০০০ হাজার টাকা ও বহরমপুর কলেজে এণ্ট্রান্স ও এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বৃত্তির জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ সুশ্রূষাকারিণী নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদিগের সেবা করায় ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভক্তি উপহার স্বরূপ তাঁহাকে ৭০ লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি সেই টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া তাহা নাইটিঙ্গেল হোম নির্ম্মাণের জন্য দান করেন। সম্প্রতি লণ্ডন সহরে নাগরিক অধিকার পত্র একটী সুবর্ণ-পাত্রে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দান করা হয়। তিনি সেই পাত্র গ্রহণ না করিয়া তাহার মূল্য ২৮০০ টাকা সুশ্রূষাকারিণীদের আশ্রমে দান করিয়াছেন।

মাদ্রাজে অশান্তি—স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষে মাদ্রাজে টিচটিকরিনের অধিবাসীরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য অনেক দোকান সুসজ্জিত করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে কোনও দোকানদারকে বেত্রাঘাত করায় জনসাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপ করে এবং পুলিশও লোকের উপর গুলি চালায়। ফলে কতকগুলি লোক হত ও আহত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ সভা—পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হওয়ায় তত্রত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য গত ১৮ই মার্চ্চ

কলিকাতা টাউনহলে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। ভারত-সম্রাট্ তুর্কিস্থান-তাতারের অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

তুলসীদাস গৃহত্যাগী হইয়া নানাস্থান ভ্রমণকরত কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রত্যহ মণিকর্ণিকাতীর্থে স্নান করিয়া শিবের চরণে প্রার্থনা করিতেন, —হে দয়াময় বিশ্বেশ্বর! তুমি আমাকে রামভক্তি দান কর। নরহরি নামে এক মহাপ্রভাব সাধু তুলসীর ঐকান্তিকী ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তুলসীকে আশা ও উপদেশ দান করিলেন। নরহরির কৃপায় তুলসী সাধনাবিষয়ে অনেক গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তাঁহার নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে নগরের বাহিরে গিয়া শৌচাদি সম্পন্ন করিতেন। শৌচান্তে জলপাত্রে যে জলটুকু অবশিষ্ট থাকিত, ফিরিবার সময় সেই জল পথের এক বৃক্ষমূলে ঢালিয়া দিতেন। একদিন সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া দেখিলেন,—পাত্রে জল নাই। বৃক্ষে জল দেওয়া হইল না, ভাবিয়া একটু দুঃখিতভাবে দাঁড়াইলেন, এমন সময় বৃক্ষ হইতে এক প্রেতযোনি বলিয়া উঠিল,—আজি জল দিতে না পারায় দুঃখিত হইও না। আমি এই বৃক্ষে বাস করি, তোমার প্রদত্ত জল আমি অনন্যে প্রত্যহ পান করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তুলসী কাতরস্বরে তাহার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"হে মহাপুরুষ! আপনাকে নমস্কার! আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই বর দিন, যেন আমি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করি।" প্রেতযোনি কহিল,—"সে ক্ষমতা আমার নাই, তবে তোমাকে এক উপায় বলিতেছি শুন! এই স্থানের কিছু দূরে কর্ণঘণ্টা নামক স্থানে এক মন্দিরে প্রত্যহ বৈকালে রামায়ণ কথা হইয়া থাকে। এক মলিনবস্ত্রধারী কুরূপ পুরুষ প্রত্যহ তথায় রামায়ণ শুনিতে আসেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে তথায় আসিয়া সর্ব্বশেষে চলিয়া যান। তিনিই সাক্ষাৎ হনুমানজী। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি কৃপা করিলেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে।" তুলসীদাস নিরূপিত সময়ে কর্ণঘণ্টাদেবালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—পূর্ব্বোক্তরূপ একটী পুরুষ তথায় সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন, এবং কথারম্ভ হইলে, জনতা হইতে একটু দূরে বসিয়া ভক্তিগদগদভাবে রামায়ণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কথাভঙ্গের পর সেই পুরুষ সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, তুলসীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। নির্জ্জনে তাঁহাকে একাকী পাইয়াই তুলসী সযোধনে

তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং রামদর্শনার্থে কাতরভাবে তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিলেন।' সেই পুরুষ তুলসীকে প্রত্যাখ্যান করিতে নানা কৌশল করিতে লাগিলেন, কিন্তু তুলসী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, দৃঢ়ভাবে তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—আপনি দয়া করিয়া রাম-দর্শনের উপায় যতক্ষণ না করিবেন, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার চরণ ছাড়িব না। কাশীধামে কোনও ভূতযোনি আমাকে আপনার সন্ধান জানাইয়া বলিয়াছেন,—তিনি যতক্ষণ না রামদর্শনের উপায় করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার চরণ ছাড়িও না। তখন হনুমান্‌জী তুলসীকে রামমন্ত্র দান করিয়া কহিলেন,—তুমি চিত্রকূটে গমন করিয়া একান্ত-ভাবে এই মন্ত্র জপ কর, ঐ স্থানেই তুমি রামচন্দ্রের দর্শন পাইবে। তুলসী চিত্র-কূটে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

একদা তুলসী চিত্রকূটে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন,—একটী হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধনুর্বাণ হস্তে দুইটী আশ্চর্যরূপ রাজকুমার অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী অপূর্ব্ব শ্যামবর্ণ ও অপরটী অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ। তুলসী চমকিত হইয়া দেখিতে দেখিতে ঐ দুই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তুলসী মুগ্ধ হইয়া দেখিলেন বটে, কিন্তু উঁহারাই যে, রাম-লক্ষ্মণ, তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অনন্তর হনুমান্‌জী পুনরায় তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,—তুলসি! তুমি চিত্রকূটে কিছু দেখিলে? তুলসী কহি-লেন,—হাঁ! চিত্রকূটে দুই অপূর্ব্ব কুমার দেখিলাম; কিন্তু তাঁহাদিগকে মৃগয়াশীল জানিয়া আর সে দিকে দৃষ্টি রাখি নাই। হনুমান্ কহিলেন,—হায় হায়! আরাধ্য বস্তুকে তুমি সম্মুখে পাইয়াও দেখিলে না? চিনিলে না? উঁহারাই রাম-লক্ষ্মণ। এ কলিযুগে দেবদর্শন বারংবার ঘটে না। তখন তুলসী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগি-লেন,—"আমি কি দুর্ভাগা! কি কুকার্য্য করিলাম! আমি জাগিয়া ঘুমাই-লাম! চিন্তামণি সম্মুখে পাইয়াও পলক-মধ্যে হারাইলাম! যখন চলিয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙ্গিল।"

"যখন চলিয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙ্গিল" —তুলসীর এ কথাটীর যাথার্থ্য মানবগণ অহরহঃ অনুভব করিতেছে, তথাপি কাহারও ঘুম ভাঙ্গিতেছে না, "কিমাশ্চর্য্য-মতঃপরম্।" এই জন্যই বলিয়া থাকে,— "দীপ থাকিতে দীপের মর্য্যাদা জানে না।" সময় ও সুযোগ থাকিতে মানব যদি বুঝিয়া চলিত, যদি যথাকালে, স্বকর্ত্তব্য প্রাণ ভরিয়া সম্পন্ন করিত, তবে আপন অনুতাপের হুতাশনে আপনি দগ্ধ হইত না, তাহার আলাময় হৃদয় এ মর্ম্মান্তিক ভেদ করিয়া প্রতপ্ত নিশ্বাস-পরম্পরা উত্থিত হইয়া তাহাকে শোষণ করিত না।

"চলিয়া গেলে ঘুম ভাঙ্গে"—অধি-কাংশ মানবের এই দশা! যখন প্রাণের

পরমারাধ্যা ত্রিলোকীদুর্লভ পিতা-মাতা এ জগতে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন জানিনা, কি এক মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম! তখন মনে হইত, আমার এই অবস্থাই স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী, এ জীবন এরূপেই কাটিবে। কিন্তু হায়! যে দিন তাঁহারা চলিয়া গেলেন, সেই দিন তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলাম, সেই দিন পিশাচী মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল। এখন মনে হয়, আবার যদি একটীবার তাঁহাদের দেখা পাই, তবে কি করি? আমার এই দেহ-মন-প্রাণ ও আত্মা একসঙ্গে বাটিয়া তাঁহাদের চরণে লেপন করি; যুগপৎ উভয়ের চরণ বুকে করিয়া মরিয়া যাই; যুগপৎ উভয়ের গলা ধরিয়া সেই যুগল বক্ষে লয় হইয়া যাই; অথবা অনন্তকাল অনিমিষনেত্রে তাঁহাদের অতুল, অমৃতময়, সর্ব্বদুঃখহারী, প্রাণারাম রূপ দর্শন করি; যুগপৎ উভয়ের কপোলে কপোল সংলগ্ন করিয়া, মা-মা-বাবা-বাবা!" বলিয়া ডাকিতে থাকি; অথবা, তাঁহারা যাহা ভালবাসেন, যাহা করিলে তুষ্ট হন, নিরন্তর তাহাই করি, আর বলি,—আমি তোমাদিগকে ফেলিয়া কোথাও যাইব না, পলকের জন্যও তোমাদিগকে চক্ষুর অন্তরাল করিব না, প্রাণান্তেও তোমাদের অবাধ্য হইব না, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। গভীর নিশীথে যখন সমস্ত বিশ্ব নিস্তব্ধ, তখন আমি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদি ও তোমাদিগকে ডাকি, তোমরা কি তাহা শুনিতে? আমার অশ্রুধারায় সমস্ত শয্যা সিক্ত হয়, আমার আর্ত্তনাদে নিশীথিনী চমকিত হয়, অন্ধকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তোমরা কি তাহা অনুভব পার?

দীনময় পিতঃ! দয়াময়ি মা! তোমরা আজি নিরাময় অশোক ব্রহ্মলোকে দিব্য রূপে ও দিব্য তেজে প্রদীপ্ত হইয়া বিহার করিতেছ। তোমরা আমার অন্তঃসাক্ষী; আমার মনের কথা, যাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, তাহা জানিতেছ। সেই সকল পূর্ব্ব স্মৃতি, যাহা আমার আত্মার সহিত জড়িত হইয়া আছে, সেই সকলের উন্মাদকর উত্তেজনা আমাকে অভিভূত করিতেছে; চাপিবার জন্য ভুলিবার জন্য যতই চেষ্টা করি, সে সকল স্মৃতি ততই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সে সকল স্মৃতির আদি, অন্ত ও মধ্য তোমরাই। আমি উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত হইয়া অহোরাত্র সেই স্মৃতিময় রাজ্যেই বাস করিতেছি। তোমাদের প্রস্থানের পর এই সুদীর্ঘ [illegible] জীবনে কত বিপ্লব, কত পরিবর্ত্তন, কত সংঘর্ষ ঘটিল, কিন্তু সে সকলি ভুলিয়া যাই; মনে হয় যেন,—মধ্যে কোনও ব্যবধান পড়ে নাই, সেই আমি ও সেই তোমরা অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। সেই স্থান, সেই জল, সেই সব কথা, সেই কার্য্য অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, সেই উৎসব, সেই আনন্দ অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। যেন সেই আমি, সেই তোমরা, সেই সব আত্মীয় অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। আমি সেই স্মৃতি ও সেই

করনীয় ডুবিয়া গিয়াছি, যেন সেই বয়সে ও সেই অবস্থায় অবিকল রহিয়াছি। কিন্তু হায়! মরীচিকার ন্যায় সেই কল্পনা-কুহক যে মুহূর্ত্তে অপসৃত হয়, তখনি হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হইতে থাকে।

এ যে কি যাতনা! বলিতে পারি না, এ বেদনা কোন্ স্থান হইতে উঠিতেছে তাহা হাত দিয়া দেখাইতে পারি না, এ পীড়ার ঔষধ নাই। তুলসীদাস! তুমি যে সাধনায় বলে তোমার হারানিধিকে আবার পাইয়াছিলে, এবং পাইয়া আর হারাও নাই, এ হতভাগাকে সেই সাধনা, সেই মহামন্ত্র শিখাইয়া দাও।

তুলসীর মর্ম্মভেদিনী কাতরতা দেখিয়া হনুমান্ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, —"বৎস! অতীষ্ট-দর্শনে তোমার যেরূপ প্রাণশোষিণী তৃষ্ণা, তুমি আবার সেই দয়াময়ের দর্শন পাইবে।" ইহা বলিয়াই হনুমান্ অন্তর্হিত হইলেন।

যে বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে, স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে, যেখানেই থাকুক, সে বস্তুটী দেবতা, মনুষ্য বা যে যোনি প্রাপ্ত হউক, তাহা সেই অদ্বৈত পরমাত্মার সহিত অনুস্যূত।

"যস্মিন্নিমানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ।
গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণাইব॥
যস্মিন্ লিতো তত্তে তন্তৌ দৃঢ়ে প্রগিব
তিষ্ঠতি।
সদসদ্ প্রবিতং বিশ্বং বিশ্বাত্মে
বিশ্বকর্ম্মণি॥"

—সূত্রে রত্নমালির ন্যায়, সেই ভূত-নাথে এই ভূতসমূহ প্রবেশ ও অবস্থিতি করিতেছে, অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের নিত্য ও সুদৃঢ় সূত্ররূপে সেই বিশ্বাত্মা সর্ব্বত্র বিস্তৃত। বিশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলি তিনি; সৎ অসৎ সকল বস্তু তাঁহাতেই প্রথিত। জাগতিক সমস্ত পদার্থের আত্মায় আত্মায় কি এক নিগূঢ় ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, তাহার তত্ত্বনিরূপণ মনুষ্যশক্তির অতীত। একান্তভাবে ভক্তি হইয়া চিন্তা করিলে, পরলোকগত আত্মীয়ের মূর্ত্তি সম্মুখে দেখা যায়, তাঁহার সঙ্গে ইচ্ছামত কথাবার্ত্তাও ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যায় না (১)।

ভক্ত একান্তভাবে ডাকিলে, ভগবান্ অরূপ হইয়াও, ভক্তের কাতর প্রার্থনায়, তাহার ধ্যেয় মূর্ত্তিতেই তাহাকে দেখা দিয়া থাকেন। তিনি ভক্তের বাঞ্ছাকল্প-তরু। কিন্তু সে ভক্তি ও সে তৃষ্ণা চাই। স্বয়ং বারংবার এ সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই তুলসী লিখিয়াছেন:—

"অজ অদ্বৈত অনাম অলখরূপ গুণরহিত
জো।
মায়াপতি সোই রাম দাসকেতু নাতহু
ধরেউ॥"

—যিনি অজ, অদ্বৈত, অনাম, অলক্ষ্যরূপ, গুণরহিত, সেই মায়াপতি রাম ভক্ত দাসের

(১) এই প্রবন্ধলেখক কয়েকবার তাহার কয়েকটী পরলোকগত আত্মীয়কে দেখিয়াছে এবং তাহাদের নিকট ভাবনা বিষয়ের সমাধান পাইয়াছে।

অন্ত নামের ধার্য্য করেন। শ্রুতির শ্বেতাশ্বতরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে ;—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

—সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি নিজ অদ্বৈত স্বরূপকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভগবান্ অনন্ত ভক্ত-মণ্ডলীর "আদুরে গোপাল," তাই তাঁহার নামেরও অন্ত নাই, ভাবেরও অন্ত নাই, রূপেরও অন্ত নাই। যে ভক্ত যখন যে নামে, যে ভাবে, যে রূপে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভক্তবৎসল হরি সেই নামে, সেই রূপে ও সেই ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার সেই সহস্রপ্রকার রূপ ও নাম, একই ভক্তি-সাগরের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ উপাধিভেদ মাত্র। কালীই বল আর দুর্গাই বল, হরিই বল আর শঙ্করই বল, রামই বল আর কৃষ্ণই বল, যে নামে ডাক না কেন, তোমার ডাক প্রকৃত ভক্তির ডাক হইলে, তোমার প্রাণ আন্তরিক হইলে, সেই ভক্তদুঃখহারী হরি অবশ্যই তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। তিনি ভক্তেরই, ভগবান্, ভক্তের হৃদয়পীঠে তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম।

নিজ প্রাণারাম মূর্ত্তিতে ভগবদ্দর্শন, তুলসীর জীবনে বহুবার ঘটিয়াছিল। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া এ ঘটনা অনেককে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। তিনি ব্রজপুরীর চৌরাশী ক্রোশ পরিধির পরিভ্রমণ করেন ; তাঁহার হৃদয়ে কেবল রঘুবীরান এবং মুখে কেবল "সীতা-রাম।" কিন্তু বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র "রাধাকৃষ্ণ" ভিন্ন, কাহারও মুখে অন্য নাম নাই। তুলসী একদা বৃন্দাবনে এক কুটীরে বসিয়া আছেন, এক বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল,—আসুন্ গোঁসাইজী! আপনাকে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখাই। ইহা বলিয়া সে তুলসীকে মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া গেল। তাঁহাকে উপহাস করিবার জন্য অনেকে তাঁহার সঙ্গে চলিল। তুলসী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—বেদিকার উপর মদনগোপালমূর্ত্তি মুরলীহস্তে বিরাজমান। তুলসী বলিয়া উঠিলেন ;—

"কহা কহোঁ ছবি আজকী, ভলে বনে
হো নাথ।
তুলসী মস্তক তব নবৈ, ধনুষবাণ লো
হাথ॥"

—অহো! নাথ! তোমার এ মূর্ত্তি যতই সুন্দর হউক না কেন, তুলসী তোমার চরণে মস্তক নত করিবামাত্র, তোমাকে ধনুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্র হইতে হইবে। ইহা বলিয়া তিনি সেই মূর্ত্তির পদে পতিত হইলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল ;—বেদিকায় সে মদনগোপাল মূর্ত্তি নাই, সেই স্থানে অপূর্ব্ব দুর্ব্বাদলশ্যাম, ধনুর্ব্বাণধারী রঘুনাথ রামচন্দ্র বিরাজমান। তখন, "জয় রাম!—জয় জয় তুলসীদাস।" ইত্যাদি আনন্দনাদে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইল। এই ঘটনার পর তত্রত্য বৈষ্ণ-

দৈবজ্ঞ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার কি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি নাই? তুলসী লজ্জা করিয়া কহিলেন,—

"শ্রীরূপে জানকীনাথে ভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥"

—শ্রীনাথ, জানকীনাথ, অভেদ উভয়,
মোহে এক পরমাত্মা নাহিক সংশয়;
তথাপি সে সীতানাথে কমললোচন—
রাম মম হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন।

ক্রমে তুলসীর অলৌকিকী শক্তি ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীর কথা দিল্লীশ্বর সাজাহান বাদসাহের কর্ণগোচর হইল। বাদসাহ তুলসীকে ঐন্দ্রজালিক (যুজরুক) ভাবিয়া, তামাসা দেখিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তুলসী সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ তাঁহাকে বলিলেন,—শুনিলাম, তুমি যুজরুক; তোমার যুজরুকি কিছু আমাকে দেখাও। তুলসী যথোচিত সম্মান ও বিনয় সহকারে কহিলেন,—আমি যুজরুকি জানিনা, আমি কেবল রামনাম জানি, আমার কাছে আশ্চর্য্য পদার্থ কিছুই নাই। বাদসাহ কহিলেন,—কে তোমার সে রাম? তাহাকে দেখাও, নহিলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তুলসী নীরব রহিলেন। বাদসাহ ক্রোধান্ধ হইয়া আজ্ঞা দিলেন,—এই বদমাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে অনাহারে ফেলিয়া রাখ। তুলসী প্রফুল্ল মনে কারাগারে নীত হইলেন। সম্রাটের আদেশে তদ্দণ্ডে তুলসীর উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। তুলসী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধ্যানমগ্ন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, এক ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল। অকস্মাৎ অদ্ভুতমূর্ত্তি, মহাকায় লক্ষ লক্ষ বানর আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করিল। নগরের প্রাচীর, দুর্গ, তোরণ, অট্টালিকাসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল। নগরবাসীরা ভয়বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। বাদসাহের দুর্গস্থিত একশের হইল। তখন বাদসাহের মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাদসাহকে নিবেদন করিল,—হে রাজরাজেশ্বর ঈশ্বরকল্প দিল্লীশ্বর! আপনি যে হিন্দু ফকিরকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, স্বয়ং হনুমান্‌জী তাঁহার গুরু। সেই দুর্জ্জয় মহাবীর হনুমান্ এ ভীষণকাণ্ড বাঁধাইয়াছে। আপনি অবিলম্বে ঐ ফকিরকে সম্মানপূর্ব্বক কারামুক্ত করুন, নহিলে আরো সর্ব্বনাশ ঘটিবে। বাদসাহ তখন নিরুপায় হইয়া তুলসীকে কারামুক্ত করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুলসী বাদসাহকে বলিলেন,—আপনি আমার আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; তখনই তিনি নিজে না আসিয়া হনুমানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বানরের দৌরাত্ম্যে দিল্লীনগর একপ্রকার উৎসন্ন হইয়াছিল। তুলসীদাস বাদসাহের নিকট বিদায়কালে তাঁহাকে লাচীন দিল্লীনগর

পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, এজন্য বাদসাহ পুরাতন নগর পরিত্যাগ করিয়া সাহজহানাবাদে (সাজাহানাবাদ) নামক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে বাদসাহের এই উপদ্রবের কথা প্রসিদ্ধ কবি নিয়ামত খাঁ অতি সুন্দরিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

দিল্লীনগরে একদা কবিকুলগুরু সুরদাস ও কবিকুলচন্দ্র তুলসীদাস, এ উভয়ের একত্র সমাগম হয়। সুরদাস কৃষ্ণভক্ত, তুলসী রামভক্ত। একদিন উভয়ে একসঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময় বাদসাহের হস্তী ক্ষেপিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। সুরদাস ভীত হইয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন,—"ওহে তুলসি! আমার ঠাকুর নন্দদুলাল দুধের ছেলে, তিনি এ প্রকাণ্ড মত্ত হস্তী হইতে আমাকে রক্ষা করিতে অক্ষম। তোমার ঠাকুর রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণধারী যুবা, তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অতএব আমি পলায়ন করিলাম, তুমি এখানে বসিয়া থাক।" তুলসী সুরদাসের বাঁকোক্তি শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। হস্তী তুলসীকে সম্মুখে দেখিয়া মহাক্রোধে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। হস্তী তাঁহার সম্মুখে আসিবামাত্র, অকস্মাৎ শূন্যপথে এক সাংঘাতিক বাণ আসিয়া হস্তীর মস্তক বিদীর্ণ করিল, হস্তী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর সুরদাস তথায় আসিয়া, সম্মুখে মৃত হস্তী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—তুলসি! এ ব্যাপার কি? তুলসী কহিলেন,—কিছুই জানি না, আমি সম্মুখে কেবল ধনুর্দ্ধারী রামমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি।

(ক্রমশঃ

আমরা কি চাই।

(৩)

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদের কি কি জিনিস চাই, এবং আমাদের প্রধান প্রধান অভাবের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইলেই হইবে না। জীবকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার কি কি রোগ আছে তাহা জানিলেই পর্য্যাপ্ত হইল না। রোগের কোন প্রতিকার আছে কি না এবং যদি থাকে তাহা কি, এ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের অবস্থা বড় শোচনীয়, রোগ বড় কঠিন। কিন্তু কোন রোগ আরাম হইবার নয় এ বিশ্বাস যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে এ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়াস করিতাম না। বিশেষ চেষ্টা করিলে এখনও আমরা বাঁচিতে পারি। তাহার জন্য আমাদের কি করা আবশ্যক নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) লোকসংখ্যার বিশেষ বৃদ্ধি

বদ্ধ করিতে হইবে। শিক্ষা সাধারণ হওয়া আবশ্যক। কি ধনী কি নির্ধন, কি ব্রাহ্মণ কি নিম্নতম জাতি, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, জাতীয় উন্নতির জন্য সকলেরই শিক্ষার প্রয়োজন। সকলকেই যে, এক শিক্ষা পাইতে হইবে তাহা নয়। যাহাকে যেরূপ কাজ করিতে হইবে, তাহার শিক্ষা সেইরূপ হওয়া চাই। যদি আমরা এক জাতি বলিয়া গণ্য হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে যে কত কাজ করিতে হইবে তার ইয়ত্তা নাই। একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এ সব কাজে বরাতি চলে না। অন্যের উপর ভার দেওয়া চলে না। কাজ আমাদের নিজেদের করিতে হইবে। যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, এবং লোকের অন্নসংস্থান হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। যাহাতে আমরা দেশজাত অধিকাংশ জিনিষ কাজে লাগাইতে পারি এরূপ শিক্ষা চাই। যাহাতে আমাদের সামান্য জিনিষের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে না হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে কতকগুলি ভাবুক ও চিন্তাশীল লোকের প্রয়োজন। সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষা না পাইলে লোকে উহা হইতে পারে না। সেই জন্য সুকুমার বিদ্যার আলোচনা আবশ্যক, উচ্চ দর্শন বিজ্ঞান ও গণিতের আলোচনা আবশ্যক, নানা ভাষার আলোচনা আবশ্যক, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। যাহাতে বেশী কথা লিখিলাম না। কিন্তু দেশের সকল লোকে উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে না। এবং সকলেরই তাহা হইলে চলে না। উচ্চশিক্ষা পাইতে যে কাহারও বাধা থাকিবে, একথা বলিতেছি না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেশের অধিকাংশ লোকের উহা পাওয়া সম্ভবপর নয়। উহা বহু সময় ও অর্থ সাপেক্ষ এবং উহাদ্বারা সকল জাতির আবশ্যকীয় কাজ হয় না। সেই জন্য কার্য্যকরী শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক, এবং বেশীর ভাগ লোকের শিক্ষা কার্য্যকরী হইলেই যথেষ্ট। ব্যবহারিক শিক্ষা আমাদের প্রধান অভাব। যাহাতে নগরে নগরে ব্যবহারিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে। কোথায় কিরূপ ব্যবহারিক শিক্ষার আবশ্যক, তাহা স্থির করিতে হইবে। কোন নগরে চামড়ার কাজ ভাল হইতে পারে। সেখানকার ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের উহা শিক্ষা দেওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। কোথাও রেশমের কাজ ভাল হইবার সম্ভাবনা। সেখানে উহা শিখাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। দেশ কৃষিপ্রধান; নানা স্থানে কৃষিবিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত হওয়া চাই দুই চারিটী ভাল ব্যবহারিক কলেজ চাই। তাহা হইলে ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা সেখানে গিয়া তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সুবিধা পাইবে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত করিতে হইবে, এবং যাহাতে পাঠার্থীরা কার্য্যকরী শিক্ষা পায়

তাহা দেখিতে হইবে। নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় আবশ্যক। সেখানকার শিক্ষা কার্য্যকরী হওয়া চাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, হস্ত ও চক্ষুর শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের নাটক উপন্যাস পড়িয়া কার্পেট বুনিয়া বা ইংরাজী সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্যের আলোচনার সময় কাটাইবার সুবিধা হইবে না। প্রায় সকলকেই সন্তানাদি লালনপালনের এবং গৃহস্থালীর ভার লইতে হইবে এবং অনেককেই স্বামীপুত্রের কাজে সাহায্য করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ত থাকিবেই, কিন্তু কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থাও বিশেষরূপ চাই। আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, সংসার চালান ও গৃহস্থালীর যাবতীয় বিষয়ে ভাল করিয়া শিখান যাইতে পারে। শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই যাহাতে স্ত্রীলোকদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় এবং বিদ্যাটা নিতান্ত পুথিগত না হয়। শিক্ষা যদি ক্রিয়াসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শিক্ষাপিপাসুদের পক্ষে সংসারের অনেক কাজ সোজা হইয়া পড়িবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্ত সকল দিকে সুবিধা হইলেও, অধিকাংশ বালিকা জোর ১০।১১ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে। তাহাদের পাঠ্য নির্ব্বাচনের সময় এ কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার।

দেশের যেরূপ অবস্থা, অনেক বিষয়ের উচ্চতম শিক্ষা এবং ব্যাবহারিক শিক্ষার অনেক বিষয় এখানে হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিক্ষার্থী পাঠান বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় যে দেশীয়দের বৈজ্ঞানিক ও ব্যাবহারিক শিক্ষাসমিতি হইয়াছে, তাহা একটী সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। ঐ সমিতিকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া এবং যাহাতে উহার কার্য্যকারিতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদের সকলের উচিত। কতকগুলি লোক বিদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভাল করিয়া শিখিয়া আসিলে তাঁহারা দেশের অন্য লোককে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন; এবং কালে ঐ সব বিদ্যা আমাদের মধ্যে এত উৎকর্ষ লাভ করিবে যে, বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠাইবার আবশ্যক আর হইবে না। জাপানে এখন অনেকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। দেশে ইতিমধ্যে আমরা যে দুই একটা কল কারখানা খুলিতে পারিয়াছি, তাহাতে যতদূর সম্ভব শিক্ষানবিশ লওয়া দরকার। কল কারখানা শুধু জিনিষ তৈয়ারির উপায় নয়, লোককে হাতে কলমে শিক্ষা দিবারও এক প্রকৃষ্ট উপায়। শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশে কতকগুলি গবেষণাগার চাই। যে সব বিদ্যার উন্নতি গবেষণা সাপেক্ষ, তাহাদের সম্বন্ধে এখানে কিছু বলার আবশ্যক নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গবেষণাগার কটি-কতক স্থাপন না করিলে দেশের উন্নতি

হওয়া অসম্ভব। ইহাতে যে অনেক টাকা চাই তাহা বলা বাহুল্য। টাকার অভাবে স্বর্গীয় মহারাণী অহল্যাবাই সরকারের বিভাগসভা হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ কাজ হইল না।

একটা কথা এখানে বলা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। মানুষ মানুষ, যন্ত্র নয়, ইহা যেন ভুলিয়া না যাওয়া হয়। অনেক উন্নতিশীল দেশে ব্যবহারিক ও কার্য্যকরী শিক্ষা এত দূর গড়াইয়াছে যে, মানুষ কলে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষা কার্য্যকরী করিতে গিয়া এবং প্রতিযোগিতা প্রবল হওয়ায় অনেক স্থানে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সুলভ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঠিক্ উহা নয় বলিয়া মনে হয়। পণ্যদ্রব্য মানুষের জন্য, মানুষ পণ্যদ্রব্যের জন্য নয়, এ শিক্ষার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সংবৃত্তি মানব-হৃদয়ের কোমল ও উচ্চবৃত্তি সমুদায়ের উচ্ছেদের সম্ভাবনা হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ সম্ভাবনার প্রতিকারার্থ দেখিতে হইবে যে, কোন শিক্ষাই যেন আত্মাবিহীন না হয়। সকল শিক্ষার মূলে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতি শিক্ষা চাই। সকলেরই কোমল ও উচ্চ মনোবৃত্তির উন্মেষ হওয়া আবশ্যক। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মভাব, সত্যনিষ্ঠতা, স্বদেশহিতৈষিতা লোকহিতৈষণা প্রভৃতি বৃত্তি সকলও স্ফূর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে মানুষ হওয়া যায় না। ইহা ছাড়া সৌন্দর্য্যবোধবৃত্তিরও সম্যক্ বিকাশ হওয়া চাই। সেই জন্য যে যে কাজ বা ব্যবসা করুক না কেন, কিছু কিছু সাহিত্য বা সুকুমার বিদ্যা ও কলা চর্চ্চা সকলেরই করা উচিত। নিজের গণ্ডীর বাহিরে যদি আমরা না যাইতে শিখি, তাহা হইলে জীবন নিরানন্দময় হইয়া উঠে, এবং জন্মগ্রহণ করা বৃথা বলিয়া মনে হয়। জীবনের সকল সময় কেহ কাজ করে না, বা করিতে পারে না। বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা বাদ দিলেও খুব ব্যস্ত লোকেরও হাতে এমন সময় থাকে, যাহাতে কোন কাজ করা যাইতে পারে না, বা করার দরকার হয় না। যদি সাহিত্যাদির চর্চ্চা কিছু কিছু থাকে, তাহা হইলে জগতের কোথায় কি হইতেছে জানিতে একটু আগ্রহ হয়, এবং সময় এমন করিয়া কাটান যাইতে পারে যাহাতে নিজের ও আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশিবর্গের উন্নতি সাধন হয়, এবং জীবনের ভার অনেকটা কমিয়া যায়।

এখন একটা কথা উঠিতে পারে। আমি যে "দান সাগরি কর্ম্ম" দিলাম, সকল দিক্ বিবেচনা করিলে উহা কি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? দেশ শুদ্ধ নরনারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে; উচ্চ শিক্ষা, মধ্য শিক্ষা, নিম্ন শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চ্চা সকলেরই ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলা হইয়াছে। ইহাও ছেলেখেলা নয়। বন্দোবস্ত করিবেই বা কে এবং তাহার টাকাই বা

কোন [illegible]। কিন্তু বাঁচিতে হইলে উহা যে আমাদিগকে করিতেই হইবে তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? কোন কাজ করিতে হইলে দুইটী জিনিষ দেখা আবশ্যক। প্রথম, উহা সুচারুরূপে করিতে হইলে কি কি দরকার, দ্বিতীয়, আমাদের পক্ষে উহার কতটুকু করা সম্ভবপর। সকল কাজেরই একটা আদর্শ থাকা চাই। তাহা হইলেই বুঝা যায় আমরা উহার কতটুকু করিতে পারিয়াছি, এবং কি পরিমাণে উহা বাকী আছে। আদর্শ বিহীন কাজ কখনও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না। উপরে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া দরকার। এক দিনে ও একবারে যে, আমরা লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইব তাহা কেহ মনে করে না। কিন্তু যদি আমরা বাঁচিতে চাই, শিক্ষা সম্বন্ধে এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুবৃহৎ কাজ দুই দশ দিনে হইবার নয়, এবং ইহা বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ। ইহার জন্য সরকার হইতে যত টাকা পাওয়া যায় তাহা আমাদিগকে লইতে হইবে, এবং তাহা ছাড়া দেশের লোকদেরও টাকা খরচ করিতে হইবে। দেশে যে সব ধনকুবের আছেন তাঁহাদিগকে অনেক অনাবশ্যক বিষয়ে খরচ কমাইয়া এই সর্ব্বহিতকর লোকশিক্ষা কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতে হইবে। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবহারিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দেশের কয়েকজন মহাত্মা অকাতরে বহুল অর্থ দান করিয়াছেন। ইহাদের ন্যায় লোক বেশী হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এবং সময়ে যে অনেকে ইহাদের পদানুসরণ করিবেন না, এ কথা কে বলিতে পারে? কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন,—এই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা কেবল ধনীদের কাজ। যিনি যাহা দিতে সক্ষম, তাঁকে তাহা দিতে হইবে। কেহ বুদ্ধি দিবেন, কেহ সময় দিবেন, কেহ অর্থ দিবেন। আমি এক টাকা দিতে পারি, তাহাই আমার দেওয়া উচিত, আর এক জন হাজার টাকা দিতে পারেন, তিনি তাহাই দিন। যাঁর এক জন লোক অপর এক জনকে কিছু শিখাইতে পারেন, তাহা বড় কম কাজ হইবে না। যাঁর বুদ্ধি আছে, তিনি কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন করুন, এবং কার্য্যকর্ত্তাদিগকে পরিচালন করুন। অনেকের সমবেত চেষ্টা যদি থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই আমরা তাহার সুফলময় ফল দেখিতে পাইব।

শিক্ষার ভাষা কি হইবে? যতদূর সম্ভব বাঙ্গালা। বর্ত্তমান অবস্থায় উচ্চশিক্ষা এবং বিশেষ কিয়ৎপরিমাণে মধ্যশিক্ষা ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় হইতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বতোমুখী উন্নতি না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত গত্যন্তর নাই। কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি চাই। সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় [illegible]

চাষক এবং উহার সাহিত্য জাতীয় উন্নতির পৃষ্ঠপোষক। বিদেশীয় ভাষা কখন জাতীয় শিক্ষার ভাষা হইতে পারে না।

শেষ শিক্ষার ব্যবস্থা যদি ভালরূপ হয় তাহা হইলে আমরা আর যাহা চাই তাহা আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের আবশ্যক নাই, আমু সঙ্গিক দুই এক কথা বলিলেই চলিবে।

(২) শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। শরীর ভাল না হইলে আমাদের দ্বারা কোন কাজ হইবে না। শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য আগে চাই। মানুষ শুধু আত্মার নয়, সে শরীরও আত্মার অধিত জীব। তুমি যতই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হও না কেন, রোগে তুমি যদি নির্বীর্য্য হইয়া পড়, শক্তির অভাবে যদি তুমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়, দেশের কথা দূরে থাকুক, নিজেরই কোন কাজে তুমি লাগিবে না। স্বাস্থ্যের দেশের পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থার আবশ্যক। প্রত্যেক গ্রামের জল নিকাশের উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। এ সবের জন্য যদি কেবল জেলা বোর্ড বা কর্ত্তৃপক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া আমরা বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কত দিন আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গ্রামের শিক্ষিত ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে কথায় ও কার্য্যে দ্বারা অপর সাধারণকে গ্রামের উন্নতির কাজে লাগাইতে হইবে। কিসে গ্রামের বালক বালিকাদের শরীর রোগমুক্ত হইতে পারে তাহা লোককে বুঝাইতে হইবে। যাহাতে গ্রামের ছেলেরা ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের জলবায়ু শারীরিক পরিশ্রমের প্রতিকূল। এই নৈসর্গিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমাদিগকে চলিতে হইবে এ কথা যেন মনে থাকে। এখানে কেবল পল্লীগ্রামের উল্লেখ করিলাম, কারণ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী, এবং আমাদের পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সহর অঞ্চলের অবস্থার আভাস পূর্ব্বে কিছু দিয়াছি। এখন এইমাত্র বলিলেই চলিবে যে, স্বাস্থ্যকর নগর দেশে বড়ই কম, এবং প্রায় সকল নগরেই গড় পড়তা মৃত্যুর হার খুব বেশী। ইহাদের বিশেষ উন্নতি আবশ্যক।

(৩) দেশে কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার উন্নতি সাধন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিবিদ্যালয়ের কথা উপরে বলিয়াছি। যাহাতে পূর্ব্ব প্রচলিত ফসল সকলের উন্নতি হইতে পারে, এবং অর্থকরী নূতন ফসল কতকগুলি প্রচলিত হইতে পারে, তাহার বিধিমতে চেষ্টা করা চাই। সকল বড় জমিদারের বা তালুকদারের তাঁদের প্রজার [illegible] এবং দেশের ভাবী মঙ্গলার্থে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র রাখা উচিত হইয়াছে। ইহা সংখ্যায় নিতান্ত কম হইলে চলিবে না। ঐ সব ক্ষেত্র হইতে তাঁদের প্রজারা যথেষ্ট

মনুষ্য শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের গো মহিষাদি গৃহপালিত পশুর অবস্থা কিরূপ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উহাদের উন্নতির দিকে যদি আমরা মন না দিই তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে উহারা লোপ পাইবে। কিসে প্রচুর পরিমাণে ইহাদের খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে, কিসে ইহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া ইহারা প্রচুর পরিমাণে ভাল দুধ প্রদান করিতে পারে, এবং ভাল করিয়া হলকর্ষণাদি কার্য্য করিতে পারে, কিসে ইহাদের মধ্যে সঙ্কর নিবারিত হইতে পারে, এ সব কাজের ভার আমাদের উপর। আমরা না করিলে আর কেহ করিবার নাই।

(ক্রমশঃ)

বেহুলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কলার মান্দাস বামে দক্ষিণে নানা গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল গ্রামবাসীগণ বেহুলার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অনেকেই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কেহ কেহ তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিল, কেহ বা তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিল। মনুষ্যমাত্রেই সংসারের সকল লোককে আপনার মত জ্ঞান করে—সরলপ্রকৃতি সাধু ভক্তই দুষ্টের দুরভিসন্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না, দুষ্ট দুরাত্মাগণ সাধুর সরলতা জনিত সুখাস্বাদে বঞ্চিত। সাধুর নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ, যাহার যেমন মন সে তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে নানা কথা বলিতে লাগিল—বেহুলা প্রায় কাহার কোন কথার উত্তর দিলেন দিলেন না, তবে ব্যক্তি বিশেষকে তিনি একবারে উপেক্ষা করিলেন না। পথিমধ্যে বেহুলার অনেক বিপদও ঘটিয়াছিল, নদীজল মধ্য হইতে কোদালী প্রভৃতি সশস্ত্র মৎস্যাদি জলজন্তুগণ তাহার স্বামীর শব আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হইল না—সে সকল আপদ অত্যাপাতে দূর পরিত্রাণ ঘটিল, পথিক ও গ্রামবাসীগণের ভয় উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেহ লোভ প্রদর্শনে তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিল, কেহ বা তাহার জন্য অত্যাচারের ভয় দেখাইল, কেহ বা চিকিৎসকের ভাণ করিয়া তাঁহার স্বামীর জীবন দানের লোভ দেখাইল, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না। পতিপরায়ণা সতীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কিছুতেই দুর্ব্বল হইল না—তিনি, বলে না হউক, কলে কৌশলে অনুনয় বিনয়ে, পাত্র বিশেষে ভয় প্রদর্শনে সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকিয়া আপনার পথে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যায়—নবিষয়ের শব আর পচিতে

লাগিল—পূতিগন্ধে চতুর্দ্দিকের বায়ু দূষিত হইল, বেহুলার মনে নিদ্রার নাই—তিনি সেই পতিরক্ষার নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহার অনেক তথাই তাঁহার সংগ্রহ করা ছিল।

এইরূপে গাঙ্গুর নদীর জলে ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা গঙ্গার সহিত গাঙ্গুর নদীর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ভাগীরথীর পবিত্র বারিধারায় অবগাহন করিলেন, স্বামীর শবও উত্তমরূপে গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইলেন, তাহার পর বিদুষীকন্যা সুরধুনীর জলে ভাসিয়া চলিলেন, মশার ভয়ে মাল্লাস প্রতিক্ষণেই টল্ মল্ করিতে লাগিল, বেহুলা তাহাতে ভীত হইলেন না, ইষ্ট দেবতার উপর আত্ম-নির্ভর করিয়া চলিলেন, ক্রমে তিনি যুক্ত-বেণী ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তখন রাত্রি শেষ হইল, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল। তাহাতে উষার আসন পড়িল। গাছে পাখী ডাকিল। সেখানে আসিয়া একটু অন্তরালে থাকিয়া বেহুলা দেখিলেন, একটী রজকী মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য উপস্থিত হইল, সে বস্ত্রের বোঝা নামাইয়া, কোলে একটী শিশু ছিল তাহাকে স্তন্য দানের পর মারিয়া [illegible]—শিশু অচেতন স্পন্দহীন অবস্থায় [illegible] রহিল, রজকী বস্ত্র কালনে [illegible] বেহুলার বাওয়া হইল না, [illegible] করিতে লাগিলেন, [illegible] রজকী গাছকোলে বস্ত্র-গুলিকে ওছাইয়া মোট বাঁধিল, মোট মস্তকে করিয়া শিশুটীকে পুনর্জ্জীবিত করিল, জীবিত শিশুকে কোলে লইয়া স্তনাদান করিতে করিতে সে আপনার পথে অগ্রসর হইল। বেহুলা রজকীর আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া তাহাকেই আপনার ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল বিবেচনা করিলেন, সে রাত্রি আর অগ্রসর হইলেন না। তথায় অবস্থিতি করিলেন। রাত্রি অবসান হইল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেদিনও প্রভাতে রজকী শিশুপুত্রকে স্তন্য দান করিতে করিতে জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ আপন শিশুকে চৈতন্যশূন্য করিল, এবং আপনার কাজে নিবিষ্ট হইল। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হইল, রজকী মোট বাঁধিল, ছেলেকে কোলে লইল, আপনার পথে অগ্রসর হইবে এমন সময় বেহুলা নিকটস্থ হইয়া তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইল, রজকী অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে উঠাইল, এবং তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইল। বেহুলা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা তাহাকে জানাইলেন। রজকীকে মাতুঃস্বসা (মাসী) সম্বোধন করিলেন, রজকী তাঁহাকে পরদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন, বেহুলা তাহাই করিলেন। তাহার নাম নেত রজকী, সে স্বর্গবাসী সুরগণের বস্ত্র কালন [illegible] পর-দিন প্রাতে সে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে বেহুলা নিজে বস্ত্র কালন করিবার কথা বলিলেন, রজকী বলিল—"বস্ত্রগুলি দেবতা-দের, তাঁহারা স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব,

কাপড় কাচা ভাল না হইলে অভিশাপের ভয় আছে, তুমি পারিবে না।" বেহুলা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া একখানিও কাপড় কাচিতে পান এরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। বেহুলার ঐকান্তিকতা দর্শনে রজকী সম্মত হইল, বেহুলা প্রাণপণ যত্নে কাপড়খানিকে কাচিল—নেত যে সকল কাপড় কাচিয়াছিল বেহুলার কাচা কাপড় তাহা অপেক্ষা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইল, সন্ধ্যাকালে নেত কাপড়গুলিকে গুছাইয়া লইয়া দেবলোকে গেল, বেহুলাও সঙ্গে চলিলেন, সেখানে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন, নেত ধোপানী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি সমন্বিত দেবসভায় উপস্থিত হইয়া বস্ত্রগুলি অর্পণ করিল। বেহুলা যে কাপড় কাচিয়াছিলেন, সেখানি মহাদেবের—তিনি দিগম্বর বলিয়াই প্রসিদ্ধ, সাধ করিয়া কখন কোনদিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, বস্ত্র দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন, নেতকে বলিলেন, "নেত! আজি যে কাপড়ের বড়ই বাহার বাড়িয়াছে, একদিনও তো এমন কাপড় কাচা দেখি না।"

নেত উত্তর করিল, আমার এক তরীর কন্যা আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, সেই আপনার কাপড়খানি কাচিয়াছে।

দেবাধিদেব বলিলেন,—তাহাকে তো কখন দেখি নাই—দেখাইতে পার?

এই কথা শুনিয়া নেত ধোপানী তাঁহার নিকট বিদায় লইল এবং বেহুলার নিকটে আসিয়া সকল কথা বলিল। বেহুলা তাহার সমভিব্যাহারে দেবসভায় গমন করিলেন। তিনি যে ভৌগোলিকী বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, নেত সে পরিচয় পাইয়াছিল। স্বর্গবাসী দেবগণ বড়ই বিলাসী—স্বর্গসুখের কথা বলাই বাহুল্য, স্বর্গসুখের তুল্য সুখ আর কোথাও নাই, কিছুই নাই, সেই স্বর্গবাসীরা যে বিলাসী হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? নেত দেবসভায় বেহুলার নৃত্যগীতজ্ঞতার পরিচয় দিলে সকলেই একবাক্যে তাঁহার নৃত্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বেহুলাও সলজ্জমে তাঁহাদের চরণতলে প্রণত হইয়া আপনার ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন, দেবসভার সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। দেবদেব মহাদেব বেহুলার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে বেহুলা সজলনয়নে আপনার পরিচয় দিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলেন এবং মৃতস্বামীর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। মনসাদেবী সভায় উপস্থিত ছিলেন না—দেবসভার আজ্ঞা পাইয়া নেত ধোপানী তাঁহাকে ডাকিতে গেল; মনসা দেবী ঘরে বসিয়া সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন, সর্ব্ব প্রথম আসিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু নেতর নির্ব্বন্ধে তাহার সমভিব্যাহারিণী হইলেন। কিয়ৎকাল মধ্যেই তাঁহারা দেবসভায় উপস্থিত হইলে জগজ্জননী মনসাকে দেখিয়া সকলেই সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন।

বেহুলা কৃতাঞ্জলিপুটে দেবগণ সমীপে পুনরায় মনসার ক্রোধে স্বামীর প্রাণনাশের সঙ্কল্প কথা বিবৃত করিলে, দেবী বলিলেন—"বেহুলার শ্বশুর গ্রামে গ্রামে আমার পূজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার জন্য আমি তাহার সকল পুত্র নষ্ট করিয়াছি ও সাত খানি জ্বালানৌকা ডুবাইয়াছি, তথাপি তাহার জ্ঞান হয় নাই, আমার অসম্মান করে।"

বেহুলা শ্বশুরের ত্রুটী মানিয়া লইলেন, আর বলিলেন, ভবিষ্যতে আর তাঁহার অসম্মান হইবে না, শ্বশুর ভক্তিসহকারে আপনার পূজার্চ্চনা করিবেন।"

মনসা ঠাকুরাণী দেবগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বেহুলাকে তাঁহার স্বামীর কঙ্কালগুলি আনিতে বলিলেন, বেহুলা দৈবশক্তি প্রভাবে ত্রিবেণীর ঘাট হইতে নখিন্দরের কঙ্কালগুলি লইয়া সুরলোকে পঁহুছিলে মনসা দেবী সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহার অভিনব কলেবরের পুনর্গঠন করিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিলেন। সমাগত দেবগণ মনসাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। মৃতপতিকে জীবিত পাইয়া বেহুলা স্বামীর অগ্রজ হয় জনের এবং শ্বশুরের সপ্ততরীর পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা জানাইলে দেবী তাহাতে কৃপণতা করিলেন না। বেহুলার চেষ্টা যত্নে চাঁদ সদাগরের সাত পুত্র পুনর্জীবন লাভ করিল, সাত ডিঙ্গার পুনরুদ্ধার হইল। বেহুলা সেই গাঙ্গুর নদীর বক্ষে সপ্ততরী, ছয় ভাসুর ও স্বামীকে লইয়া চাম্পাই নগরে উপস্থিত হইয়া শ্বশুর শ্বশ্রূর চরণ যুগলে প্রণত হইলেন। সকলেই বেহুলাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—অতঃপর চাঁদ মনসার মাহাত্ম্য মানিয়া লইলেন, নানা উপচারে মহা আড়ম্বরে তাঁহার পূজা করিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন সাত পুত্র, সাত বধূ ও বহু পৌত্র পৌত্রীকে লইয়া কিছুকাল সংসারসুখ ভোগের পর ইহলোক লীলা সম্বরণ করিলেন।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত।

বীরনারী জিন মেরী গায়েন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

পরীক্ষারূপির বিষম আঘাতে যখন মেরী গীয়েনের প্রতিজ্ঞাপূর্ণ কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবন ভগবানের আশীর্ব্বাদের বলে বলীয়ান্ হইয়া কঠোর সংসারপথে চলিতেছিল, তখন তিনি বল ও শান্তি লাভ করিবার ব্যাকুলতায় হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া, শয্যাশায়িনী হইলেন। "হয়ত এযাত্রা আপনার রক্ষা নাই," চিকিৎসক যখন অনেক সন্তর্পণের সহিত এ কথা তাঁহাকে জানাইলেন, তখন মেডেম

গায়েনের আনন্দের সীমা রহিল না। তরুণবয়স্কা মেরীর জীবন এত অসহ্য ক্লেশপূর্ণ ছিল যে, তিনি মৃত্যুকে প্রসন্নমুখে আলিঙ্গন করিতেও ভীত হইলেন না। ঠিক্ এই সময়ে কাউণ্ট গায়েনের অনেক সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। এই সংবাদেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পার্থিব দুঃখরাশির নিকট তিনি শির অবনত করিয়াছিলেন। সংসারের কোন কষ্টই তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা ক্লেশ দিতে সমর্থ নহে, ইহা তিনি দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যদ্বারা সকলকে উত্তমরূপে বুঝিতে দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অপরিসীম রোগযাতনা ভোগের পর তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যের মুখ দর্শন করিলেন। এখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করাতে, তাঁহার স্বামীর কোপানল শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া নিশিদিন এই সাধ্বীর সুকোমল জীবন দগ্ধ করিতে লাগিল। "তোমার দেখি ঈশ্বরভক্তি স্বামিভক্তি অপেক্ষা অধিক," এই বলিয়া বাতরোগাক্রান্ত, শয্যাশায়ী, বৃদ্ধ ও অপদার্থ স্বামী, পত্নীর নির্য্যাতনে সচেষ্ট হইল। মেডেম গায়েনের উপাসনার বিঘ্ন সম্পাদন জন্য মাতা ও পুত্রে অনেক কুমন্ত্রণা চলিতে লাগিল। স্বামীর রোগশয্যা সমীপে কিম্বা ঐ পিশাচী শ্বশ্রূর প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকা ভিন্ন তাঁহার কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। দুঃখিনী মেরী অনন্যোপায় হইয়া যখন সেলাই দ্বারা সময় কাটাইবার প্রস্তাব পাইতেন, তখনও তিনি উপাসনার্থে মুখ ফুটেন কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য পরিজনগণ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত।

মেরীর অন্ধকারপূর্ণ জীবনের অন্তরস্থে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পাছে পিতার সংসর্গগুণে সেও ঐরূপ পিশাচ-প্রকৃতি লাভ করে, এই আশঙ্কায় কতদূর ও অসীম ধৈর্য্যবলে পুত্রটীর শিক্ষা ও সুমতি দানের জন্য প্রাণপাত করিতেন, তাহা অবর্ণনীয়। মেরী জিনের সমস্ত আশা ভরসাস্থল ও কুজ্ঝটিকাপূর্ণ জীবনের আলো ঐ সন্তানকে পর্য্যন্তও জননীর প্রতি অবজ্ঞা ও অপমান করিতে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এই ভীষণ পরীক্ষাসময়ে একমাত্র প্রার্থনাই তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি ঐ সময়ে দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন, "পৃথিবীর কাহারও সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, মনেও হয় না। সুতরাং তাহাদের অনাদর, অবজ্ঞা ও তাড়না, কিছুতেই হৃদয়ের প্রগাঢ় শান্তি বিনষ্ট হয় না। সংসারের পক্ষে আমি মৃতা। ঈশ্বর আমাতে বাস করেন। তিনিই জীবনের জীবন ও ঘোর তিমিরসাগরে ধ্রুবতারা। তাঁহার বলেই আমার পরীক্ষাহত ক্ষীণ প্রাণ শক্তিশালী"। পাঠক! মেরী গায়েনের হৃদয় শুধু প্রার্থনার বলে কি অতুল শান্তিপূর্ণ ও সবল হইয়া কঠোর কর্ত্তব্যপথে অনাহতভাবে ধাবমান ছিল, তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করুন। এই মহীয়সী মহিলার জীবনীপাঠে কে বলিতে সাহসী হইবে যে, ঈশ্বরদর্শন কল্পনার কথা! মেরী গায়েন

যে সকল মনোহর কবিতাস্তবক গ্রথন করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যজগতে তাহার অক্ষয়া সৌরভে চিরকাল নর নারীর হৃদয়কে উন্মত্ত ও বিমুগ্ধ করিবে। সময়ান্তরে ঐ সকল কবিতার ভাবাংশ লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল।

ক্রমশঃ।

গোধন রক্ষা।

ভারতে নিত্য বহুসংখ্যক গোধন ধ্বংস হইতেছে, সমগ্র ভারতবাসীর যেরূপ অনিষ্ট হইতেছে, অবশিষ্ট ধ্বংসোন্মুখ গোধন-কুলকে অচিরে রক্ষা না করিলে, এবং গোজাতির বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না করিলে যে, কিছুদিন পরে ভারতবাসীর পক্ষে অধিকতর মহা অনিষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিত। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ এদেশে আগমন করিয়া, যেমন আমাদিগের শিল্প, পণ্য, ব্যবসা, বাণিজ্য, নষ্ট করিয়া সমুদয় ভারতবাসীকে নিতান্ত হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, তেমনি প্রতিদিন এই গোধনগুলিকে ভক্ষণ করতঃ ভারত-বাসীর অনায়াসলব্ধ গোদুগ্ধ পানে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন এবং ইহাদের উন্নতির সর্ব্ব-বিধ বন্ধের অভাবে ইহারা দিন দিন রোগগ্রস্ত ও বলহীন হইয়া পড়িতেছেন। আজ ভারতবাসীর সে প্রতিভা বীর্য্য নাই, সে তেজ দর্প নাই, সে সাহস বিক্রম নাই, সে উদ্যম দৃঢ়তা নাই,—বলকারক খাদ্যাভাবে ভারতবাসী আজ নিস্তেজ ও হীনবল। গোদুগ্ধই ভারতের জল বায়ুর উপযোগী, উৎকৃষ্ট বলকারক খাদ্য। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; এ দেশে নিত্য মাংসাহার কদাপি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য ও অনিষ্টকর। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, মাংস অপেক্ষা দুগ্ধ আটগুণ অধিক বলকারক। পরন্তু দুগ্ধ সাত্ত্বিক আহার, মাংস রাজসিক আহার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, সাত্ত্বিক আহার সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অতীব মঙ্গলকর। আমাদের আর্য্যশাস্ত্র-কার মনু ও সর্ব্ববিধ মাংসাহার যে আমা-দের পক্ষে নিষিদ্ধ তাহা নিম্ন শ্লোকেই দেখাইয়াছেন;—

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

(মনু ৫ অ, ৫৫ শ্লোক।)

পাশ্চাত্য দেশবাসিগণই যে কেবলমাত্র গোকুলকে ধ্বংস করিতেছেন তাহা নহে, যে অবধি মুসলমানগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সময় হইতে গোবংশ ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তবে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা যেরূপ সহস্রধারে গোধন নিধন করিতেছেন, তাহার তুলনায় মুসলমানগণ শতাংশের একাংশও করেন নাই। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে অনেকে আদৌ গোমাংস ভক্ষণ করেন না।

যাহারা বা গোমাংস আহার করেন, তাহারা অনেকেই প্রত্যহ খান না। পর্ব্ব উৎসব ব্যতীত দৈনিক শাক শবজী, ডাল, অন্ন, দুগ্ধ, মৎস্য খাইতেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্য গোমাংস-ভক্ষক মুসলমানের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু য়ুরোপীয়দিগের অত্যাদরবশতঃ তাঁহাদের গোমাংস ভক্ষণ ব্যতিরেকে দিন অতিবাহিত হয় না। আবার আমাদিগের দেশের ও কতকগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষানবিশী অবিমৃষ্যকারী হিন্দু পুরুষ ও মহিলা পাশ্চাত্য অনুকরণ করতঃ গোরক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, গোমাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত ঘৃণা ও দুঃখের বিষয়। এই গোমাংসভক্ষক সাম্প্রদায়িকেরা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, অতি প্রাচীনকালের মুনি ঋষিগণও গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। পুরাকালের কয়েকজন মুনি ঋষি যে গোমাংস আহার করিয়াছিলেন ইহা অলীক বাক্য নহে বটে (১) কিন্তু তাঁহারাই যখন বুঝিতে পারিলেন যে, গোমাংস ভক্ষণ অপেক্ষা গোজাতির রক্ষণই দেশের ও দেশবাসীর পক্ষে মহাহিতকর, তখন হইতেই তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণ যে মহাপাপ, তাহাই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় হইতে হিন্দুর পক্ষে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। এমন কি তাঁহারা গোমাংসাহারী ব্যক্তির সহিত হিন্দুর একত্র পান ভোজনেও যে মহাদোষ, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, অধুনা নব্য সভ্য সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ পুরাকালের মুনি ঋষিদিগের দেশহিতকর নিষেধবাক্য অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, গোমাংস ভক্ষণ করিলেই কি এত পাপ হয়? মৎস্য, মেষ, ছাগ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করায় কি পাপ হয় না? জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন, সর্ব্বজীবহত্যাই মহাপাপ! গো হননেও যে পাপ হয়, ক্ষুদ্র শফরীর বধেও সেই পাপ। তবে যে মৎস্যভোজী, সে শুধু প্রাণিহত্যা-জনিত পাপই অর্জ্জন করে, গোখাদক প্রাণিহত্যাজনিত পাপও অর্জ্জন করে এবং গোধনকুলকে নিধন করিয়া সর্ব্ব-

(১) প্রাচীন আর্য্যগণ যৎকালে হিমালয় পার হইয়া ভারতে আসিয়া বাস করেন, তৎকালে অতি শীতপ্রধান ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতিতে তাঁহাদের বাসভূমি ছিল। শীত প্রধান স্থানে বাস করায় তাঁহারা অনেকে গো মাংস ভোজন করিতেন। ক্রমশঃ যখন উষ্ণ প্রধান ভারতবর্ষে তাঁহারা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলেন তখন শাস্ত্রে গোমাংস ভোজন একেবারেই নিষিদ্ধ হইল। প্রায়ই দেখা যায় এদেশের গোমাংসভোজীরা কুষ্ঠাদি বীভৎস রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে গোজীকে লোকমাতা বলিয়া থাকে। মাতৃস্তন্য বৈশাখে কিছুদিন মাত্র সেব্য, কিন্তু "গোস্তন্য সর্ব্বাবস্থায় মুমূর্ষুকাল পর্য্যন্ত সেবনীয়। যাহার জন্মমূত্র পর্য্যন্ত অশেষ মঙ্গলের আধার, তাহার ন্যায় মহোপকারী—অন্য জন্তুর জীবিত এ জগতে আর কি আছে, জানি না।

গাভীরমুকে গোদুগ্ধ পানে বঞ্চিত করার মহাপাপও অর্জ্জন করে। এই সভ্য সম্প্রদায়িকেরা গো-বধ হেতু যে পাপ হয় সেই মহত্যাকে কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। ইহাদিগের সমীপে গোধন রক্ষার কথা উত্থাপিত করিলে ইহারা গোঁড়ামি বলিয়া পরিহাস পূর্ব্বক সে কথা উড়াইয়া দেন।

এইরূপে তিন সম্প্রদায়ের গো-ভক্ষণে এদেশের গোজাতির সংখ্যা দিন দিন ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। দিনে দিনে গো-ভক্ষকের সংখ্যা এরূপ ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে, ভারত হইতে যে গোজাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাণিজ্যনিপুণ পাশ্চাত্য দেশবাসিগণেরও বোধ হয় ইহাই অভিপ্রেত যে, ভারতের গোবংশ সমূলে নির্ম্মূল হইলে বিলাতি জমাট দুগ্ধ এদেশে সরবরাহ করিয়া তাঁহারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যান। হায়! আজ ভারতবাসিগণ গোধনকুলের রক্ষার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! গোধনকুল বিনাশ হেতু ভারতের যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কেহই দেখিয়াও দেখিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। আজ ভারতবাসিগণ জাতীয় জীবনের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট। জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে জাতির শারীরিক ও মানসিক বিপুল শক্তির প্রয়োজন। শক্তি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে জাতির পুষ্টিকর আহারের আবশ্যক। দুর্ব্বলের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি কুত্রাপি সংসাধিত হয় না। দুর্ব্বল ব্যক্তি ঘোর তমোগুণাপন্ন, ভয়-মোহ, নিদ্রা, আলস্য, লজ্জাবন্ধন প্রভৃতি অসৎ গুণের দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছন্ন। বলিষ্ঠ ব্যক্তি রজোগুণসম্পন্ন—তাঁহারা নিরলস, উদ্যোগী, সাহসী, কর্ম্মশীল ও বীর্য্যবান্। জ্ঞান হইলে, মনুষ্য রজোগুণ হইতে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়। আজ বলকারক সাত্ত্বিক আহার অভাবে ভারতবাসী দুর্ব্বল হইয়া ঘোর তমোভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

বিলাসিতার মোহে আক্রান্ত হইয়া ভারতবাসী আজ বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা, মটরকার, বিলাতি, কুকুর, বিলাতি পাখী ইত্যাদি ক্রয় করত যে টাকা অপব্যয় করিতেছেন, সেই টাকায় যদি গোধন রক্ষা করেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের মহান্ উপকার করা এবং স্বকীয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। আজ যদি আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপিতামহের সঞ্চিত গোধনগুলি বংশপরম্পরানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে কি বৎসরে বৎসরে অজন্মা দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি নরনারী অকালে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইত? শস্তাভাবে সকলে গো-দুগ্ধ পানেই জীবন ধারণ করিতে পারিত। চিকিৎসকেরা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন যে,—মনুষ্যের শরীর-রক্ষার উপযোগী সমুদায় পদার্থই গো-দুগ্ধে বিদ্যমান আছে। পুরাকালে দুগ্ধ ঘৃত এত সুলভ ছিল যে তখনকার লোকেরা

প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া উৎকৃষ্ট ঘৃতে মিষ্টান্ন ভোজনাদি করিতেন। সেকালের অধিকাংশ লোকই সাত্ত্বিক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে লোকে একটু ঘৃত দুগ্ধ খাইতে পান না, ভোজনাদি করিবেন কি প্রকারে? সুতরাং পুরাকালের সেই পুণ্যপ্রদ বৈদিক ভোজনাদি ক্রিয়া এখন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল গোধনের সংখ্যা হ্রাস হওয়া বশতঃ খাঁটি গো-দুগ্ধের মহা অভাব হইয়াছে। যদিও পশ্চিমাঞ্চলে কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় বিস্তর কম আইন আকবরীতে দেখা যায়.—পূর্ব্বে খাঁটি গো-দুগ্ধ টাকায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সের পাওয়া যাইত, বর্ত্তমান সময়ে অতি কষ্টে সহরে টাকায় চারি সের সাড়ে চারি সের দুগ্ধ মিলে। পশ্চিমাঞ্চলে টাকায় বার তের সেরের অধিক পাওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বে গো দুগ্ধের সজ্জলতা প্রযুক্ত ক্ষীর, সর, দধি, ননী, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর ও তৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য সমূহ সুলভে পাওয়া যাইত। আকবরের সময়ে গব্য ঘৃত যেখানে টাকায় পাঁচসের ছিল, আজকাল গো-সংখ্যার অল্পতা হেতু গব্য ঘৃত সেখানে টাকায় চৌদ্দ সের হইয়াছে। পূর্ব্বে ঘৃতের প্রাচুর্য্যতা নিবন্ধন ঘৃত-পক্ক উপাদেয় মিষ্টান্নের খাদ্য সামগ্রীও অতি সুলভ ছিল; অধুনা দুগ্ধের অভাবে দুগ্ধোৎপন্ন এবং ঘৃতপক্ক আহার্য্য বস্তুসমস্তই অতিশয় মহার্ঘ্য হইয়াছে। উৎসব ও পার্ব্বণ উপলক্ষে সহরে সন্দেশ আদি নকুই টাকা মণ হয়, ক্ষীর পঞ্চাশ পঁচাত্তর টাকা মণ হইতেও দেখা যায়; এবম্প্রকার যজ্ঞতীয় দুগ্ধোৎপন্ন বা ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি অধিকতর মহার্ঘ্য হইয়া থাকে। এবং দিনে দিনে মহার্ঘ্যতার মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। সকল সৃষ্টির দরিদ্র ভারতবাসী—যাহারা একাহে উদর পূরিয়া আহার করিতে পায় না, তাহারা এই সকল দ্রব্য অধিক মূল্য দিয়া কি প্রকারে খরিদ করিতে পারে? এদেশের দুগ্ধ ও অন্নই প্রধান খাদ্য, কিন্তু অন্ন তো বহুদিনই বিদেশের অধিকৃত হইয়াছে, গো-দুগ্ধও নিঃশেষ প্রায়। দেশের তণ্ডুল দেশে রাখিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই, যে হেতু বিদেশী বণিকগণ বিস্তর অর্থ দিয়াও এ দেশ হইতে খাদ্য স্বদেশে লইয়া যাইবেন। সে স্থলে দরিদ্র দুর্ব্বল ভারতবাসীর প্রতিযোগিতা করা সহজসাধ্য নহে। দুগ্ধ রাখিবার এখনও কিঞ্চিৎ উপায় আছে; ভারতের সমগ্র ইতর ও ভদ্রমণ্ডলী কেবলমাত্র গোপদিগের প্রতি গোধন রক্ষার ভার অর্পণ না করিয়া, যদি সকলেই অবস্থা অনুসারে গো পোষণ করেন এবং প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি গাছ প্রতিষ্ঠা, পুকুর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের ন্যায় "শ্রীকৃষ্ণ গোশালা" সদৃশ এক একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাইয়া বা গোচারণভূমি ক্রয় করিয়া দেন, তবে গো-রক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। যাঁহারা গোশালা

প্রতিষ্ঠায় ব্যয়ভার বহন করিতে ও গো পোষণ করিতে অক্ষম, তাঁহারা ক্ষমতা অনুযায়ী চাঁদা দান করিয়া যদি ভারতের প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক পল্লীতে শ্রীকৃষ্ণ-গোশালার ন্যায় সম্মিলিত সাহায্যে এক একটী গোশালা স্থাপন করেন এবং তাহাদিগের বল, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ক্রমোন্নতির বর্ত্তমান সময়োপযোগী উপায় নির্দ্ধারণ ও তাহার অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে অনেক গোধনের জীবন রক্ষা হয় ও সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে ঐ সকল স্থান হইতে উত্তম গো-দুগ্ধ ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। ঐ সকল গাভীর গর্ভোৎপন্ন বৃষগুলিকে বিনামূল্যে কৃষকনিচয়কে প্রদান করিলে তাহাদের পক্ষে বহল উপকার হইতে পারে। কেননা এক জোড়া বলদ এখন আশি পঁচাশি টাকার কমে পাওয়া দুঃসাধ্য। এত অধিক মূল্যে দরিদ্র কৃষকগণ বলদ ক্রয় করিয়া দারুণ ঋণভারাক্রান্ত হইয়া অবশেষে কৃষিকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু যদি সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে তাহারা বিনামূল্যে বলদগুলি পায়, তাহা হইলে পুনরায় কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাহারা অধিক শস্য উৎপন্ন করাইতে পারে এবং [illegible] তাহাদের পারিবারিক জীবন-[illegible] করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু [illegible] বিষয়ে কেহই মনো-[illegible] যাহা [illegible]

স্বার্থপরায়ণ অর্থপিশাচ এই গোপগণ আজকাল গো-রক্ষণে যত্নবান্ না হইয়া গোভক্ষণেই সহায়তা করিতেছেন। গাভী প্রসব হইলে কিছুদিন পরে তাহার শাবকটীকে কসাইকে বিক্রয় করেন, এ দিকে দুগ্ধ দোহনের সময় বিচালী নির্ম্মিত একটী কৃত্রিম গোবৎস গাভীর সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়েন। পুনশ্চ অধিক দুগ্ধ লাভের আশায় গাভীকে ফুকা দেন। আহা! ফুকা দেওয়া হেতু গাভীর সে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা পর্য্যবেক্ষণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। কিন্তু নির্ম্মম নরপিশাচ গোপগণ সে ভয়ানক লোমহর্ষণ কর্ম্ম করিতে কিছু মাত্র বিচলিত হয়েন না। সেই ফুকা দেওয়া বিসদৃশ দুগ্ধ পান করতঃ কত শিশু স্ত্রীহত্যা বকৃতাদিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে, কত রোগীর ব্যাধি গুরুতর বৃদ্ধি পাইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় তাহাদিগের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বারংবার ফুকা দেওয়া হেতু এবং সমুচিত আহার অভাবে অচিরে কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গাভী যখন দুগ্ধ দানে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়, তখন তাহাকে দুই এক মাস উপযুক্ত আহার করান হয়। পরে একটু হৃষ্ট পুষ্ট হইলে নৃশংস কসাইকে অধিক মূল্যে গোপগণ গাভীটি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এইরূপে গোধনকুলের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া, ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানকালের গোপগণ আচা হইবার

আমার জগন্মাতা গৃহলক্ষ্মীদের ধ্বংসের সহায়তা করেন বটে, কিন্তু এই জঘন্য পাপ ব্যবসা দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বিশেষ ধনবান্ হইতে পারিয়াছেন? তাঁহারা যা সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই কোন সন্তান অজ্ঞান অপব্যয়ে সেই অর্থ নিঃশেষিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু পুরাকালের গোপগণ গো রক্ষা করতঃ এত অর্থ সঞ্চয় করিতেন যে, তদ্দ্বারা এক একটী রাজত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন। গোপরাজ নন্দঘোষ তাহার প্রমাণ স্থল। তিনি বহু সহকারে গোধন রক্ষা করত বিপুল অর্থ লাভ করিয়া গোকুলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে গোপেরা তো প্রাণপণে গোধন রক্ষা করিতেনই, এতদ্ভিন্ন রাজা, মহারাজ, জমিদার, ইতর, ভদ্র, সর্ব্বসাধারণেই গো-গোধন করিতেন। তাঁহারা গোধনের সম্মান ও মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত ভগবতী বলিয়া গোধনের পূজা করিতেন। এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং গোচর্য্যা ও গোচারণ করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে গোপালরাজ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাকালের মহিলাগণ অপমান না ভাবিয়া স্বহস্তে গো-দোহন করিতেন, তন্নিমিত্তই কন্যাদিগের দুহিতা আখ্যার উৎপত্তি। পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষের যত্নেই গো বংশের অত উন্নতি হইয়াছিল। সামান্য ত্রুটি বশতঃ ও গোহত্যার গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইতে সহজেই ইহা প্রতীয়মান করা যায় যে, গোজাতিকে হিন্দুরা কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন এবং কত মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। গো-জাতিকে প্রাণে মারিলেই পৌরব পুস্তক হইত না, সাবিত্রী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যম বলিয়াছিলেন,—

গোমাহারং প্রকুর্ব্বন্তং নিবন্তং যো নিবারয়েৎ।
যাতি গো বিপ্রয়োর্মধ্যে গোহত্যাকৃৎ লভেত্ত্রসং ৪
ষষ্টিবর্ষাণ্যসৃগ্ভক্ষী যূচ্যে যো বিপ্রবৃষঘাতকঃ।
দিনে দিনে পশোর্হত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ৪
যদাস্থি উচ্ছিষ্টং ভোজয়েদ্ বৃষঘাতকম্।
ভোজয়েদ্ বৃষঘাতারং স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবং ৪

পূর্ব্বে রাজ্যধন লইয়া রাজায় রাজায় পরস্পরের মধ্যে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তদ্রূপ গোধনের নিমিত্তও ঘোরতর যুদ্ধ হইত। সেকালে যাঁহারা যুদ্ধের যুদ্ধ-কলাকৌশল জানিতেন, অস্ত্রে শস্ত্রে বলে কৌশলে যে প্রকারেই হউক তাঁহারা সেই পরবিনীটী আপন আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। পুরাণে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিরাট রাজার গোধন-হরণ তাহার একটী প্রমাণ। তখনকার লোকেরা অর্থের অপেক্ষা গোধনের মর্য্যাদা অত্যধিক জ্ঞান করিতেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সমস্ত রাজ্য-ধনের বিনিময়ে বশিষ্ঠ মুনির সকাশে একটী গোধন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। মেধোপম মুনিবর সেই পবিত্র [illegible]

প্রতারণা করিয়া বীর সর্ব্বৈশ্বর্য্যরূপ গোধনটীকে কোনমতে মহারাজ বিশ্বামিত্রকে লইতে দেন নাই। আর আমরা এমনি কুতঘ্ন যে, যিনি জন্মভূমির সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যিনি দুগ্ধাদি প্রদান করতঃ গোমাতারূপে অতীব রক্ত-বল বর্দ্ধক, মেধাশক্তিদায়ক নিজ রক্ত-ক্ষীর-সুধা নিত্য আমাদিগকে পান করাইয়া, আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছেন—যে দেবী ভগবতীর দুগ্ধ বিশ্বলপক্ষকের সকল প্রাণীর দুগ্ধাপেক্ষা সুমিষ্ট রুচিকর ও সুগন্ধবিশিষ্ট, যাঁর অস্থি, চর্ম্ম, চর্ব্বি, শোণিত, মূত্র, ক্ষুর এমন কি মলমূত্র পর্য্যন্তও মানবের মহোপকারী, সেই প্রাণদায়ী জগন্মাতা গোলক্ষ্মীর রক্ষার্থে আমরা বিরত! যেমুতে ভগবানের প্রত্যক্ষ বিভূতি ও বিদ্যমান বলিয়া ইনি আবহমান কাল হইতে ভগবতী আখ্যায় বিভূষিতা। ইঁহাকে আমরা কোন্ প্রাণে নিষ্ঠুর গোদিগের দ্বারা নানাপ্রকার কসাইয়ের হস্তে তুলিয়া দিতেছি? আসুন ভ্রাতাভগ্নীগণ! আমাদের পূজ্য আর্য্য পিতৃমাতৃগণের ন্যায় রূপময়ী জন্মভূমি লক্ষ্মী-স্বরূপা যেমুকুলের রক্ষা জন্য প্রাণপণে যত্নবান্ হই।

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্যঃ এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

কাব্য লেখা বিষয়ে মহাপণ্ডিত রাস্‌কিনের অভিপ্রায়।

রাসকিন্ (Ruskin) তাঁহার কোন গ্রন্থে (Modern Painter) লিখিয়াছেন যে, পড়িতে হইলে শ্রেষ্ঠ কবিতাই পড়া উচিত। যদিও সকলের কবিতা লইয়া বিব্রত হইবার আবশ্যক নাই। উত্তম কবিতার অভাব নাই বরং এত অধিক আছে যে, এক জীবনে তাহা পড়িয়া শেষ করা যায় না। নিম্নশ্রেণীর কবিতা লেখার কবিতা পড়িয়া সময় নষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কোন কোন কবি মনে করেন যে, তাঁহাদের কাব্যে কিছু না কিছু ভাল আছে, ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। যদি উন্নতির আশা থাকে, তবে এখন লোককে বিরক্ত করা কেন? এই সকল কবির প্রতি রাসকিনের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই। তিনি বলেন যে, সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও মনে করিলে কোনও কোনও ভাব কবিতাতে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোক এরূপে সময় নষ্ট করিতে চাহেন না, আর যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কবিতা ভাল বাসেন ও কাব্যের মর্ম্ম বুঝেন, তাঁহারা যেমুরে গাহিতে অনিচ্ছুক। ইহা ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর কবিতা উচ্চশ্রেণীর কবিতার অনেক হানি করে।

কাব্যের নবীনতা ও মাধুর্য্য বিলুপ্ত হয়, ভাল ভাবও নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হয় ও পাঠকের অকারণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। সচরাচর যে সকল ভাব সাধারণ লোকের মনে উদয় হয় তাহার নূতনত্ব নাই, কারণ সেই সব ভাব পূর্ব্বে কোনও না কোনও উচ্চশ্রেণীর কবি উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাস্কিন্ বলেন,—নিকৃষ্ট কবিতা না লিখিয়া উচ্চশ্রেণীর কবিগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বোত্তম স্থলগুলি যদি আমরা নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণ লোকের মন তাহাতে আকৃষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে যথার্থ উদারতা প্রকাশ করা হয় ও যথেষ্ট হিত সাধন হয়।

অধুনা আমাদের দেশে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইতেছে, তাহার অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর। সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রে এই সকল কবিতার ছড়া ছড়ি হইয়া পড়িতেছে। রচনার মাধুর্য্য কিম্বা রস, ভাবের নূতনত্ব বা বৈচিত্র কিছুই নাই এরূপ কবিতা যত কম প্রকাশ হয় ততই ভাল।

কি চিন্তায়, কি লেখায়, কি ব্যবহারে যতই উচ্চ আদর্শ অবলম্বিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল। অনেকে উচ্চ উচ্চ বিষয় লইয়া কাব্যাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু নিজে সে সকল চরিত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম, গভীরতা ও প্রসার হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উচ্চ আদর্শগুলিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলেন, কিন্তু ভাষার মাদকতায় সেগুলিকে এরূপ চিত্তাকর্ষক করেন, যে, অপরিণতবুদ্ধি সাধারণ পাঠকেরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

গৃহ-চিকিৎসা।

১। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ। লাল নটেশাকের শিকড় ৵০ দুই আনা, এবং গোলমরীচ ৫ টী এক সঙ্গে বাটিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরোগ্য হয়।

২। বাতিক বেদনার ঔষধ। কলমি শাকের রস এক ছটাক সেবন করিলে বাতিক বেদনার উপকার হয়।

৩। পারদ সেবন ঘটিত দূষীত্বে কোন প্রকার দুষ্টক্ষি প্রভৃতি হইলে আমরুল শাকের রস গায়ে মাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এবং আমরুল শাকের রস ও মূলার রস এক সঙ্গে সেবন করিলে মূত্র পথে পারদ নিঃসারিত হয়।

৪। বাত বেদনার ঔষধ। যে কোন স্থানে বাত বেদনা হইলে বৃদ্ধি গোপালের রস, এরণ্ডের তৈল ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ এক সঙ্গে মিলাইয়া মালিস করিলে অচিরে বেদনা নিবারণ হয়।

৫। পারদ বিকারের কিম্বা বাতরক্তের ঔষধ। এক তোলা বিশুদ্ধ গন্ধক এক সের দুগ্ধে আল দিয়া তোলা ক্ষীরের সঙ্গে করিয়া একুশটী বটিকা করিবে [illegible]

পিছন বেলা এক একটী বটিকা সেবন করিলে পারদ-দোষ ও রক্ত-রক্ত আরোগ্য হয়। এরূপ তিন সপ্তাহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালীন ঘৃতসৈন্ধব-যোগ পাকে নিরামিষ আহার করিতে হইবে।

৬। অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী রোগের ঔষধ। অশ্মরী রোগ হইলে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা হইলে কুলথ কলাই (কুলথী কড়াই) ও সজিনার বীজ উভয় এক তোলা করিয়া ঐ মিলিত দুই তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৭। মাদনা (তিসী) দুই তোলা এক পোয়া জলে চায়ের মত প্রস্তুত করিয়া খাইলে মূত্র-রোধ ও আশা নিবারণ হয়।

নূতন সংবাদ।

১। স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ গত ২১ শে মার্চ্চ হোটলাট সার এণ্ড ফ্রেজার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া পরলোকগত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন।

২। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এস্ পি সিংহ স্থায়িভাবে বঙ্গের এডভোকেট জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই স্থায়ী পদলাভ বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রথম।

৩। ১৮ ই ও ১৯ শে এপ্রিল ময়মনসিংহে মুসলমান প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইবে।

৪। [illegible] বরোদার মহারাজা [illegible] কৃষিবিদ্যিগের জন্য একটী [illegible] কলিকাতা মূক-[illegible] শিক্ষা প্রণালী অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মূকবধির শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত প্রার্থনীয়।

৫। চিন গবর্ণমেণ্ট স্বীয় রাজ্যে যাহাতে কেহ আফিমের নেশা করিতে না পারে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, এবং ইংরাজরাজকেও তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যে চিন অধিবাসীরা যাহাতে আফিমের নেশা করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

৬। ভাগলপুর জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাস্করী শর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয়, যিনি বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দান করিবেন, ঘোষণা করিয়াছেন।

৭। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় হেন্‌রী কাম্বেল ব্যানারম্যান্ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর-

গ্রহণ করিতেছেন। তথা হইতে মিঃ এস্‌ কুইথ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

৮। গত ১৮ ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা ফেডারেসন্‌ হলে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পালের অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট সভা হয়। সভায় প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া পাল মহাশয়কে দেওয়া হয়।

৯। সম্প্রতি কোন সম্ভ্রান্ত পাদ্রি ওভারটুন হলে বক্তৃতা কালে বলেন, —আমরা যখন বিলাত হইতে মিসনের কার্য্যে আগমন করি তখন আমাদের মনে এই কথাই জাগরূক থাকা উচিত যে, আমরা একটী প্রাচীন জ্ঞানোজ্জ্বল ধর্ম্মপ্রাণ জাতির নিকট যাইতেছি। এই মহাজাতি সেই প্রাচীন জ্ঞান ধর্ম্মের গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

বামারচনা।

কাশী

(১)

কোথা কাশী বারাণসী পুণ্য তীর্থ ধাম?
যথা করে বিশ্বেশ্বর, বিরাজিত বিশ্বেশ্বর,
মম চিত্ত তথা যেতে চাহে অবিরাম।

(২)

যে মানব কাশী মাঝে হেরে বিশ্বেশ্বরে,
জীব ভাব গিয়ে তার, হয় শিব ভাব সার,
পশিবে সংসার চিন্তা থাকে না অন্তরে।

(৩)

কাশী তীর্থে বিশ্বনাথে নেহারিব কবে!
পেতে তাঁর দরশন, সতত ব্যাকুল মন,
দেবাদিদেবের দেখা কবে তাপ্যে হবে?

(৪)

কাশী গিয়া বিশ্বনাথে করিলে দর্শন,
তবেই কি মুক্তি হয়, নতুবা কিছুই নয়,
তাই কি সে কাশী যেতে চাহে প্রাণমন?

(৫)

পাপী আমি জ্ঞানহীনা মোহান্ধ ললনা,
তাই ভাবি কাশী গিয়ে,বিশ্বেশ্বরে নেহারিয়ে,
হবে মোর মহা মুক্তি পুরিবে কামনা।

(৬)

বুঝিনা আমারি দেহ তীর্থ কাশী ধাম,
অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়,
পূত সে বিজ্ঞানময় পঞ্চকোষ নাম।

(৭)

শুদ্ধ জ্ঞানধারা আদি গঙ্গা প্রবাহিত।
শান্তিময় পূত চিত্ত, সে মণিকর্ণিকা তীর্থ,
নিত্যজ্ঞান সুখানন্দ তথা বিরাজিত।

(৮)

শিবানী ভবানী বুদ্ধি আত্মা সে ভৈরব,
নিষ্ঠাই অদ্বৈত রূপ, পাপ পুণ্য সাক্ষী রূপ,
বিরাজিত দেহ মাঝে অযোনিসম্ভব।

(৯)

আমারি এ দেহ কাশী করিয়া নির্ম্মাণ,
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপ্রাণ, করিছেন অধিষ্ঠান,
মোহান্ধের ভ্রান্ত আমি তাঁরে ভাবি আন।

(১০)

তিনি আমি ভিন্ন নই পারিনা বুঝিতে,
জ্ঞানহীনা তাঁরে তাই, ভেদ ভাবি সর্ব্বদাই,
বাহ্যি মাঝে সমষ্টিকে পাইনা দেখিতে।

(১১)

নিরখিলে দেহ মাঝে দেব বিশ্বনাথ,
হবেনা জনম আর, লয় পায় পদে তাঁর,
সৃষ্টি মোর মিশে যাবে সমষ্টির সাথ।

(১২)

হেতে চাহি বিশ্বনাথে হেরিতে কাশীতে
কবে দেহ-ত্যাগী মা-ময় নেত্রারিণী নিঝরিণী,
ঐহিক বাসনা ত্যজি নিত্যানন্দ লভে ?

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

অশ্রুধারা

জাহ্নবীর তীর।

প্রথম সর্গ।

শান্তির ক্রোড়েতে সুপ্ত ধরণী সুন্দরী,
উপরে অনন্ত নীল চন্দ্রাতপ শোভে,
প্রস্ফুটিত অগণন তারামালা তায়,
পৌর্ণমাসী পূর্ণচন্দ্র অমল ধবল,
ঢালিছে জোছনা-রাশি ধরণী-অঙ্গেতে
দিগন্ত নীরব—
জননীর অঙ্কে যথা সুপ্ত নব শিশু ;
এ হেন নিশিতে, কাহার ক্রন্দন,
ওই পশিছে শ্রবণে ?
সংসার গরল পানে কোন হতভাগা
আমা সম বুঝি কাঁদে নির্জ্জনে বসিয়া ?
কিম্বা কোন পুত্র শোকাতুরা !
প্রাণের পুতলিময়—আশার মুকুল,
ঝরিয়াছে শুষ্ক করি হৃদি বৃন্ত তার,—
অকালে, করাল কালে
পুত্র-রত্ন করি সমর্পণ,
তুলিয়াছে এ নিশায় মর্ম্মভেদী রোল ?
না ! বুঝি কোন বিধুর বিধবা !—
নির্জ্জন এ নিশি, ঊর্দ্ধে নীল নভো,
নিম্নে নীলিমা সাগর,
শুভ্র দশদিশি,
অনন্ত জগত কোটি কোটি প্রাণী
সবে শান্তিতে মগন, সে শান্তিতে
বিধবা না হ'লে—
কোথা আর জ্বলে তবে অশান্তি-অনল ?
হরি বল ! হরি বল !—
একরূপেতে বিধবা কাঁদে না ?
ধরিত্রী জিনিয়া ধৈর্য্য,
গভীর বারিধি সম গম্ভীর সে হৃদি,
হাসি মুখে বেদনা লুকায়,
নিভৃত নির্জ্জনে ঢালে তপ্ত অশ্রুধারা
জগতের কেহ তা জানেনা।
হায় ! আমি কি বাতুল !
এ যে পরিচিত ত্রিদিব-সঙ্গীত—
মাতা জাহ্নবীর গীত ?
মরি মরি কিবা অমিয় মাখান গান !
মাগো এই কি গো স্বরগীর সুর ?
ত্রিদিব নিবাসিগণে এইরূপে গায় ?
হায়, কেমনে বাখানি
কি সুধা ঢালিছ মাগো জগত-শ্রবণে !
কিন্তু একি শুনি ?
শোকোচ্ছ্বাস—মর্ম্মভেদী তায়,
কত যেন বেদনা মাখান সুরে।
দেবলোক-নিবাসিনী তুমি দেববালা,
কি জ্বালা মা তোর ?
অভাগা নরের মত

কি বিষাদে কাঁদিছ গো ধরার ফিরিয়া ?
তবে কিগো স্বরগেও জ্বালা আছে !
ত্রিদিবনিবাসিগণও কাঁদে
তবে আমাদের মত ?
মিলেছে গো ভাল !
আমিও কাঙ্গাল মাগো তুইও কাঙ্গালী,
মায়ে পোয়ে চল ছুটাইগে
পশি কোন নিভৃত গহনে, কিম্বা কোন
সুদূর প্রদেশে, যথা না প্রবেশে
তব সংসারের গোল।

কেন দেখে সঙ্গে করি নেবাইবে মোরে ?
আমি তোর কাঙ্গাল সন্তান,—
বল-না-মা !—নেবাবে না মোরে ?
বুঝেছি ! কি আর বলিব,
পূর্ণ কর বাসনা তোমার,
কিন্তু মিনতি আমার !—
জীবন-গগনে যবে গোধূলি ছাইবে,
ঘোর মলিন হেরিব চৌদিক্ বেড়ি
আঁধারে ডুবিলে পরে আর দুর্গা মোর,
তুলে নি'ও কোলে গো জননি ! (ক্রমশঃ)।

১৩১৪ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
নববর্ষ প্রণাম	১
অন্ত র্থনা ও আশা	২
ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা	২
নববর্ষের নবচিন্তা-জগতের আশ্চর্য্য	৩
নূতন বৈশাখ	৪
আমেরিকার নারীসমাজ	১৩, ৪৭
মহিলা সমিতি—বাদ প্রতিবাদ ...	৪৯
প্রার্থনা	১১৮
বামাবোধিনীর পঞ্চত্বারিংশ জন্মোৎসব	১২৯
মঙ্গল-স্মৃতি সভা	১৪৫
নিবেদন	১৪৮
বামাবোধিনীর ৪৬ জন্মোৎসব সভা	১৫০
জন্মদিনে	১৮০
বামাবোধিনীর পঞ্চত্বারিংশ জন্মোৎসব	১৮৭
বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ...	১৯৫
বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা	২১৬
হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের জীবন গণানী	২৩৮
জানদা ও সমোদার কথোপকথন	২৯৯

২। নারীচরিত ও নারী জাতির সৎকীর্ত্তি।

মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী	১৫
লেডী ডিপণ	১৮
মীরাবাই	২৫১
সীতা	২৭০
বীরনারী জিন মেরী গাথেন	২৯৯, ৩১১

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

স্বভাবের শিক্ষা	৪৯
প্রেমের শক্তি বা পাশব শক্তি	৫৪
ভাগবতোপাখ্যান	৬৬
আতিথেয়তা	৭৭
কাল	৮২
ধর্ম্মের আদর্শ	১০৯
প্রেমের জয় ও সিদ্ধিলাভের গূঢ় তত্ত্ব	১৭৫
খেতকেতুর উপাখ্যান	২৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ভগবান্ ভক্তের অধীন	৩০৫
গীতার ব্যাখ্যা	৩০৯
বিধবা-মোহের পরিণাম	৩৩০
ইতর শ্রেণীর নিকট লেখের শিক্ষা	৩৩৬
৪। ইতিহাস, জীবনী ও দেশভ্রমণ।	
বঙ্গমহিলার হিমালয় ভ্রমণ	২৪,৫৭,৮৫, ১৮৪,২০৮,২৪৫
স্বর্গীয় আনন্দমোহনের ঈশ্বরভক্তি	৭১
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত	৮৯
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৪র্থী শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে পঠিত	৯০
ধর্ম্মবীর ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত	৯৭
শোকোচ্ছ্বাস	১০৯
নিদাঘ পূর্ণিমায়	১৪১
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত	১৮৩
মহাত্ম উমেশচন্দ্র দত্তের পরলোকগমনে	২৭২
কাশ্মীর	৩০৬
ভক্তকবি তুলসীদাস	৩২৩,৩৪৬
৫। পুরাণ ও উপন্যাস।	
প্রতিজ্ঞা পূরণ	৮,৩৪,৭৯
খুল্লনা	২০,২৪৭,২৭৯
পরির গল্প	২৩
তপতী	৩৯,১৪৫,১৭৮,২২৭,
অমলা	৫০,২১১,২৬৩
বহুজী চম্পাবৎ	১৬৯,১৯৬,২৩৩,
মিলন	৩১২
বেহুলা	...৩০৪,৩৬৮
প্রণয়ে প্রমাদ	৩৪২,
৬। বিজ্ঞান।	
রসায়ন—নাইট্রোজেন বা নীলজান	৬৯
হাইড্রোসায়েনিক এসিড	৭০
রসায়ন	১০৭
সদ্যোজাত শিশুর রোগনির্ণয়	১৩৮,২০৭
আমিষ ও নিরামিষ আহার	১৬৩
আমাদিগের রন্ধন শাস্ত্র	২০২,২৩৫
কেন আমি নিরামিষাশী	২৩১
হেলীর ধূমকেতু	২৪৩
চা পান	২৬৭
৭। গৃহ চিকিৎসা ও গৃহ কার্য্য।	
পাচন ও মুষ্টিযোগ	২৮৪,৩৪৮,৩৮০
৮। পদ্য।	
রাজেন্দ্র নাথ	১৬
বাল্মীকি	৫৬
মহাযাত্রা	৭৬
আষাঢ়ের চাঁদ	৮৩
তুমি নাই?	১১৪
মহিলা স্মৃতি-সভা	১২০
প্রয়াণ	১২৩
ভগিনীর বিলাপ	১২৪
শোকগাথা	১২৬
শোকোচ্ছ্বাস	১২৭
বাধিক	১৫৩
শুভ দৃষ্টি	১৬৯
পত্নীহারা	১৭২
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে	১৭৭
একটী ছাত্রের পত্র	২০১
বর্ষশেষ	২০৫
সতীযাত্রা	২১৪
শূন্য প্রস্তাব	২২৬
মেহগনী তরুর প্রতি	২৩২

ইণ্ডিয়ন্ ২৪২
পুরাতন রিপোর নবীন আরোহন ২৪৮
নিবেদন পত্র ২৬৪
সংসার ২৯০
ভেকগাথা ২৯৮
স্নেহোপহার ৩৪১

৯। বিবিধ

সংক্ষিপ্ত নূতন পত্রিকা ১
ব্রহ্মদেশে শিক্ষা প্রদর্শনী ৩৭
জীবরাজ্যে ঐশ্বরিক বিশেষ ব্যবস্থা ৫৫
বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল ৬০
অদ্ভুত গোবোহন ৮৪
শোকোচ্ছ্বাস ১১৬
স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি ১৫০
রামায়ণের কথা ২০০
আমরা কি চাই ২৫৯,২৯১,৩১০,৩৬১,
নিবেদন ৩১০
দুঃখ কি ? ৩৩৮
গোধন-রক্ষা ৩৭৩
কাব্যলেখা বিষয়ে মহাপণ্ডিত রস্কিনের অভিপ্রায় ৩৭৯

১০। সাময়িক প্রসঙ্গ।

৬,৩৩,৬৫,১৩০,১৬১,১৯৩,২২৫,২৫৭,২৮৯, ৩২১,৩৫৩,

১১। নূতন সংবাদ।

২৬,৬৫,৮৭,১২৮,১৫৬,১৮৯,২২০,২৫২,২৮৫ ৩১৮,৩৪৯,৩৮১

১২। গ্রন্থাদি সমালোচনা।

২৮,১৫৬,১৯০,২২১,২৮৫,৩৫০

১৩। বামারচনা।

নববর্ষ ২৮
নববর্ষে আবাহন ২৯
নববর্ষের উপহার ২৯
মৃহৎ শিশু ৩০
মাতৃভূমি ৬১
প্রিয় ৬২
সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রতি জননী ৬২
কি যেন গো নাই ৬৮
প্রার্থনা ৬৮
শোকগাথা ১৫৯
শ্রাদ্ধবাসরে ১৬০
শেষ ১৬০
চুম্বিক-চিত্র ... ১৯১,২২৯,
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রতি ২২১
কাশীধামে ফৌজবিচারের রাজার কাশীবাড়ী ২৫৩
ভৈরবী সৈকতে ২৫৪
মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে ২৫৫
অন্ধের উক্তি (যোগশরায়) ২৫৬
বলিদান ২৮৬
গৌরী-কুণ্ড ৩১৯
দানের পূর্ণতা ৩২০
প্রার্থনা ৩৫১
কোকিল ৩৫২
কাশী ৩৮৩
অন্নধাত্রী ৩৮৩

১৪। ইংরাজি

৩১,৬৩,২৫৩,২৮৮

১৫। চিত্র।

অদ্ভুত গোবোহন ৮৪
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত ...

৬৩৩ সংখ্যক নিমের লেন ইণ্ডিয়ান মেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
৩৫ নং আমহার্ষ্ট লেন হইতে প্রকাশিত